KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪/- ৪/- ৪/- ৪/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৩ আষাঢ়, ১৩৬৩ শ্রাবণ ১৩৬৩ কার্তিক, ১৩৬৩
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

চুলের যত্ন নিন

চুলের গোড়াগুলো রীতিমত পরিষ্কার ও পুষ্ট রাখতে হবে, আর মস্তিষ্কের স্নায়ুকেও স্নিগ্ধ রাখা চাই। এ ব্যাপারে একটি ভাল তেল আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করতে পারে। নিয়মিত কেশরঞ্জন ব্যবহারে আপনার চুল ও মস্তিষ্ক সমানভাবে উপকৃত হবে। কেশরঞ্জনের ভেষজগুণের উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারা যায়।

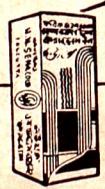

কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশ তৈল

কবিরাজ
এন.এন.সেন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ আষাঢ় ১৩৬৩

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত জগতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ববিধ চর্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য্য।
৩৬নং গোয়াবাগান রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্বত্র

॥ সূচীপত্র ॥

চতুর্থ বর্ষ আষাঢ় ১৩৬৩

প্রবন্ধ

সমাজ ও সন্ন্যাস : নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ১৩৭

কবিতা

বন্ধ্যা রাত : বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী ১৪৭
তোমাকে : অরবিন্দ ঘোষ ১৪৮
মন-বিহঙ্গী : মৃগেন মুখোপাধ্যায় ১৪৯
হৃদয়-বিকেল-কবিতা : পরিমলচন্দ্র বিষ্ণু ১৫০

গল্প

সোনার গারদ : মানব গঙ্গোপাধ্যায় ১৫১

উপন্যাস

পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৩

আলোচনা

সাহিত্য-সমালোচনা : সুতপা দত্ত ১৬৮
"শেষের পরিচয়"-র পরিচয় : জীবেন্দ্রকুমার গুহ ১৭১
রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতার মনস্তত্ত্ব : প্রফুল্লকুমার দাস ১৭৬

রেডিও-নাটক-সিনেমা

নাটকে সমস্যা : হীরেন বসু ১৭৮

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন : সিদ্ধার্থ সেন ১৮০
নজরুল সাহিত্য সম্মেলন : সুস্মিতা সেন ১৮৩

আগামী সংখ্যা থেকে স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস "এক ছিল কন্যা" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী
মোহিনী মিলস্ লিমিটেড
(স্থাপিত—১৯০৮)
১নং মিল কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)
২নং মিল বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)
ম্যানেজিং এজেন্টস্ :
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সমকালীন
চতুর্থ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৬৩

সমাজ ও সন্ন্যাস

নরেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম

ভারতীয় জীবনযাত্রাকে সমগ্রভাবে দেখলে ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলেনা। আমাদের এই গতানুগতিক জীবনযাত্রা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও বাস্তব ইতিহাসের অনিবার্য্য বিবর্ত্তনের অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয় না। চলমান জীবনের পশ্চাতে রয়েছে এক অগ্রগ প্রেরণা, যার ফলে সম্ভব হ'চ্ছে ক্রমবিকাশমান বিশ্ব-জীবন প্রবাহের ঐতিহাসিক ধারা। ভারতীয় সমাজ জীবনও এই অখণ্ড জাগতিক জীবনের একটি অবিভাজ্য অংশ। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে আমরা এই সত্যটি উপলব্ধি করিনা, এই উপলব্ধির সহায়ক ও অনুকূল কোন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের নেই। ধর্ম্মীয় ও আচার অনুষ্ঠান অনুসৃত হচ্ছে মধ্যযুগীয় ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে, মনের মধ্যে সজীবতার কোন স্পর্শ নেই। এখানে জীবন বলতে যা দেখি তা আচারের নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই জন্যই আধুনিক সমাজ জীবনে সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কোনো স্থান আছে কি-না এই প্রশ্নের আলোচনা ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক দিক থেকেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রমী সমাজেও সন্ন্যাসীদের অস্তিত্বের জন্য কোনো স্থান সামাজিক কাঠামর অভ্যন্তরে ছিল বলে মনে হয় না। চতুরাশ্রমের সন্ন্যাসের সাথে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। বৌদ্ধ শ্রমণ বা পরিব্রাজকও ইহারা নহেন, বৌদ্ধদের সেবাধর্ম্মের আদর্শ অনুসরণ করেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধুরা। এই সাধুগণ প্রাগার্য্য যুগের শৈব সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী নহেন। প্রধানতঃ ইহারা বৌদ্ধ সংস্কৃতির দায়াদ। বৌদ্ধদের সমাজ সেবায় কোন অলৌকিক উপায়ের স্থান নেই। আমাদের আলোচ্য সন্ন্যাসীরা কিন্তু ভিন্নশ্রেণীর মানুষ। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সমাজের আধিক পরিপুষ্টি ইহাদের লক্ষ্য নহে। মানুষের আদিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ত্রিতাপ নিবারণের অলৌকিক আশ্বাস ইহাদের একমাত্র পুঁজি, অথচ ইহার কোন বাস্তব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বহুকালগত ধর্ম্মাচার-নিষ্ঠ তীর্থ ও ব্রতের মোহগ্রস্ত মানুষের মনের চারিদিকে যে অচল প্রাচীর গড়ে উঠেছে, যার ফলে অধিকাংশ মানুষই পারলৌকিক কল্যাণের মোহে সম্মোহিত তারাই এই সন্ন্যাসীদের আশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করে নিজেদের মুক্তির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেন। ইহলোকেও সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাদের ব্যক্তিস্বার্থকে সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই যে বাস্তব জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত ও ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসরমান এই প্রত্যক্ষ তথ্যটি ইহারা গ্রহণ করেননা, এদের পুঁজি

সেই অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা বাস্তব জীবনের উপর যার প্রভাবের কোন লক্ষণই নেই। আমাদের দৈনন্দিন যাত্রার মধ্যে অলৌকিকতা কিছুই নেই; শ্রমলব্ধ উপার্জন দ্বারা স্নেহ ভালবাসার পাত্রদের নিয়ে আমরা গৃহযাত্রা নির্ব্বাহ করে চলি, মানুষকে ভালবাসতে চাই বাঁচতে চাই ইহাই জীবনের সমাজ ধর্ম্ম। সাংসারিক জীবনের ত্রিতাপ নিবারণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়কে মানুষ ক্রমশঃ গ্রহণ করে চলেছে ও চলবেও। দুঃখ ব্যাধি ও দৈবী আপদ জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য অঙ্গ। জপতপ পূজার সার্থকতা ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই থাকুক না কেন ত্রিতাপ ইহাতে নিবারিত হয় না দুঃখের পরিমাণ কমে না, সাধন ও সহনশীলতার জন্য মানসিক শক্তি সঞ্চিত হতে পারে—এই মাত্র।

বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
ইত্যাদি……

এই প্রার্থনার একটি সার্থকতা আছে, কিন্তু অলৌকিক উপায়ে রুগ্ন সন্তানের জীবনদান উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে প্রচুর লাভ সন্ন্যাসী গুরুর কৃপায় সম্ভব বলে যারা প্রলুব্ধ চিত্তে বিশ্বাস করেন, আমার মনে হয় তারা আত্ম প্রবঞ্চিত। এই আত্ম প্রবঞ্চনা কেন আমাদের সমাজে বর্ত্তমান যুগেও সম্ভব, ইতিহাস সমাজ-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার বিচার এই বৈজ্ঞানিক প্রতিযোগিতা-মূলক জাগতিক জীবন যাত্রায় একান্ত বাঞ্ছিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতীয় সভ্যতা হাজার বছরেরও আগে একটি স্তরে উপনীত হয়ে হঠাৎ কেন থেমে গিয়েছে, তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছে এবং সেই থেকে সুরু হয়েছে পুনরাবৃত্তি, প্রাচীনের রোমন্থন, এবং রোমন্থন ক্রিয়া এখনও চলেছে—হয়ত একটু প্রবলভাবে স্বাধীনতা লাভের পর। স্বাধীনতার পুরোধা রক্ত-পঙ্কিল পথে অপসারিত হয়েছেন, ফিরে এসেছে অন্ধ-সঙ্কীর্ণ জাত্যাভিমান, মিথ্যা ধর্ম্মাচারের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা। রাষ্ট্রীয় প্রগতিশীলতার সহিত আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও ব্যক্তি স্বার্থপরতার বিরোধ বেঁধে উঠেছে, পারলৌকিক কল্যাণ বিতরণের মুখোস পরে সন্ন্যাসীঠাকুরেরা এই ব্যক্তি-স্বার্থপরতাকেই পুষ্ট ও শক্তিশালী করে চলেছেন তাদের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে সমগ্র ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও। বৈজ্ঞানিক জীবনাদর্শ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সহিত এই পারলৌকিকতার মুখোসপরা লৌকিক ব্যক্তি-স্বার্থপরতার যে মূলগত বিরোধ রয়েছে তা আমরা এখনও বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইনা, দেখবার শক্তিও হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষ পরাধীন পরমুখাপেক্ষী, ধর্ম্মের নামে এই পরমুখাপেক্ষিতা ও দাসমনোবৃত্তির ব্যাপক অনুশীলন চলেছে গোটা ভারতবর্ষে। বিজ্ঞান অগ্রসর হয়েছে ধর্ম্মীয় গুরুবাদের আশ্রয়ে বা প্রশ্রয়ে নয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের উপর ধর্ম্মীয় প্রভাবের কথা ইতিহাসে লেখেনা। বিজ্ঞানীদের ছিল ও আছে আত্মশক্তিতে অগাধারণ আস্থা, তাদের গবেষণাগারের তপস্যা ধর্ম্ম নিরপেক্ষ, একমাত্র মানব হিতৈষণাই তাদের উদ্দীপক মন্ত্র। এখানে অলৌকিতার পুঁজি নিয়ে ধর্ম্মগুরুর দল কৃপা বিতরণ করছেন এ

কথার প্রমাণ নেই, অথচ দেখতে পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিকেরা জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতির সূচনা করেছেন প্রচারপত্রীর দ্বারা এ দুর্ভাগা দেশে গ্রহণ করতে চাইছেন এ দেশের ধর্ম্মগুরুর দল—যেন এই উন্নতি তাদেরই পরোক্ষ কীর্ত্তি। পেনিসিলিন প্রভৃতি আধুনিক বিস্ময়কর ভেষজ বা এটমিক এনার্জ্জি কোন ধর্ম্মগুরু তার আশ্রমশিষ্যদের সহায়তায় এ যুগে আবিষ্কার করেছেন বলে তো মনে হয় না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাগুরুরা ছিলেন আশ্রম-ঋষিরা, তারা গুরুত্বের দাবী নিয়ে শিষ্যদের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন এমন কথা শাস্ত্রে লেখেনা, তারা শিক্ষা দিয়ে মানুষ তৈরী করেছিলেন। গুরু ছিলেন প্রাচীন ভারতে পিতৃস্থানীয়, বর্ণাশ্রমী সমাজে ঋষি-ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল, ইহা যে আধুনিক দীক্ষাগুরু পোষন নহে শাস্ত্রই তার প্রমাণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অনুশীলন হয়েছিল প্রাচীন ভারতের আশ্রমযুগে ও বৌদ্ধযুগে, গত আটশো বছরের দীক্ষাগুরুদের ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নেই। সক্রিয় মননশক্তি নিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিভার জন্ম ভারতের বিগত হাজার বৎসরের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগের পূর্ব্বে দেখা যায় না, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রেও দীক্ষামন্ত্র বিফল। মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের খণ্ডরাজ্যের রাজন্যবর্গ যে নিতান্ত গুরুবৎসল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্যও দেশের শত্রু বিতাড়নের ক্ষেত্রে এই গুরুদের আধ্যাত্মিক প্রভাব ভারতের বাস্তব দুর্ভাগ্যের গতিরোধ করতে পারেনি। দুঃখ ও দুর্গতির ভিতর দিয়ে এই অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি। তাই ঐ দীক্ষা-গুরুদের নবজাগরণে ও নতুন অভিযানে আমরা যদি কিছু শঙ্কিত হয়ে থাকি তা হলে তা বিস্ময়কর বলে বিবেচিত হবে না বলেই মনে করি। স্বাধীনতার যে সংগ্রাম গেলো, তাতেও ধর্ম্মগুরু ও সন্ন্যাসীরা কিছুই করেননি, ফাঁসিকাষ্ঠে যারা ঝুলেছে ও মৃত্যুপণ করে সারা সংগ্রাম লড়েছে, তাদের অনুপ্রেরণা পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে।

সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলেছে ব্রাহ্মণ্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতার মনকে বন্দী করে রাখে অচলায়তনের অভ্যন্তরে। একথা আর অস্বীকার করার উপায় নাই যে সমাজের উপর ইতিহাসের ধারায় ক্রমশঃ ক্ষীয়মান ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব এখন লোপ পেতে বসেছে। বিবাহ শ্রাদ্ধ ও উদ্ধাম উৎসবের অনিয়ন্ত্রিত হট্টগোলের মাঝখানে পুরোহিত পান একখানি অনুগ্রহের আসন ও নগণ্য পারিশ্রমিক। ধর্ম্মের যাদুদণ্ডটি ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীঠাকুরদের হাতে গিয়ে পড়েছে। ইংলোকের দুঃখ ও ক্লেশ অশান্তি হতে মুক্তিলোভী ব্যষ্টি মানুষ পারলৌকিক কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসীদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সমাজের নীর্ষস্থানে ধন ও ঐশ্বর্য্যের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে সুখ ও স্বচ্ছলতার মধ্যে যারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাদের উপরও দেখি সন্ন্যাসী গুরুদের অপ্রতিহত প্রভাব। ঋকবেদ কত হাজার বছর আগে লিপিলেখনে পরিণত হয়েছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সেদিন বা সে সময় আজ থেকে অন্ততঃ চারহাজার বছর আগে। ঋকবেদের সময় ভারতীয় আর্য্যগণ উত্তর ভারতে পঞ্চনদের বহুলাংশে বিজয়ী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই সময়ে প্রাক্ আর্য্য ভারতীয় মানব-সমাজের সাথে তাদের যে একটা বিরোধ চলেছিল তা অনায়াসে অনুমান করা চলে।

আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল অধিবাসিরা নানাস্থানে ছড়িয়ে বাস করতেন তাদের মধ্যে লিঙ্গ-প্রতীক শিব-উপাসক মানুষ যে ছিলেন তাও বিশ্বাস করার উপযুক্ত প্রমাণ মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। সে যুগেই মানুষের ইতিহাসে কৃষিযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সমাজজীবনের সেকালের সুস্পষ্ট ছবি এখনও আমাদের নিকট উদ্ভাসিত হয়নি। তথাপি একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে তখনকার দিনের উপাস্য দেবতাগণ মানুষের কৃষিজীবনের সহায়ক রূপেই কল্পিত হয়েছেন। লিঙ্গপ্রতীক শিব-উপাসনার মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর উর্ব্বরতার আশা। মিশর ও মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে যে এই শ্রেণীর উপাসনা-প্রথা প্রচলিত ছিল তা আজ প্রায় সর্ব্বজন স্বীকৃত। ভারতবর্ষের শিব-উপাসনার ঐতিহাসিকতা প্রাক্ আর্য্যযুগের তিমিরাচ্ছন্ন অতীতকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। ভারতের জন-মানসে শিব ও তাঁহার ঘরণী একাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব অব্যাহত রেখেছেন। ইতিহাসের পথে শিব কি ভাবে মহাদেব ও মহেশ্বরে পরিণতি লাভ করেছেন বিজয়ী আর্য্যদের ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবে গঠিত সামাজিক কাঠাম বর্ণাশ্রমের সঙ্গে তাঁহার কত সংঘাত যে হয়েছে তার বিচিত্রধারার পরিচয় লাভ আজ বাস্তবিকই দুরূহ। তথাপি একথা অনায়াসে বলা চলে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে সমাজ-জীবনে সেই সংঘাতের অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র আর্য্যেতর সভ্যতার দান। শিব সেখানে যোগীশ্বর। ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তখন ও এখন এ যোগীশ্বর শিবেরই প্রধানতঃ উপাসক। ব্রাহ্মণেরা সহজে এই যোগীশ্বর শিবের প্রাধান্য ভারতীয় সমাজজীবনে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হননি। প্রাক্ আর্য্যযুগের শিব-উপাসক ভারতীয় আদিবাসীরা উত্তর ভারত থেকে বিজয়ী আর্য্যদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ ভারতে ও ভারতের বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিব কিরাতগণের দেবতা। আর্য্য ও অনার্য্যদের মধ্যে প্রাচীনকালে অনবরত যে সংগ্রাম চলেছিল তাতে শিব ছিলেন অনার্য্যদের সহায়ক আশা ও ভরসার স্থল। তপস্যাবলে আশুতোষ শিবকে তুষ্ট করে অমরত্ব লাভ করেও তারা পরাভূত হতেন বিষ্ণুভক্ত আর্য্যদের নিকট। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এই আর্য্য অনার্য্যের সংঘাত ক্রমশঃ আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই বিবদমান মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান ক্রমশঃ অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। শিব সমাজ-জীবনে এই পথে ক্রমশঃ আদৃত হতে থাকেন। মহাভারতের মধ্যে সমাজ-জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তাতেই আমরা দেখি শিবও আর্য্যব্রাহ্মণদের বিষ্ণুদেবের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বেদাচারী ব্রাহ্মণেরা শিবের প্রাধান্য কোনদিনই স্বীকার করেননি, এখনও করেননা। আজও শিবের নিকট উৎসর্গীকৃত প্রসাদী পুষ্প ফলাদি আগে গোবিন্দকে অর্পণ না করলে ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয় হয়না।

মহাভারতের যুগে শিব ভূত-ভাবন ভগবান। ভূত-প্রেতগণের উপাস্য ও নায়ক। শিব তখন কৃষ্ণের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছেন। কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে বৈদিক দেবতা ছিলেন কি-না সন্দেহ কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণকে নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাহার সহায়তায় আর্য্যসংস্কৃতির সামাজিক কাঠাম অনার্য্য সংঘাতের প্রভাব

থেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, যদিও ইতিহাসের পথে তা সম্ভব হয়নি। যাহা হউক কৃষ্ণকে আর্য্যসংস্কৃতির সমর্থকরূপে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণেরা শিবকে তার নিম্নে স্থান দিয়েছেন। শিবকে তাই আমরা দেখি কৃষ্ণের আদেশে পাণ্ডব শিবিরে নিশাকালে দ্বাররক্ষক রূপে। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ হয়েও শিব উপাসক। এই শিবকে তুষ্ট করে পাণ্ডব-শিবিরে কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহযোগে প্রবেশ করে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও পঞ্চ পাণ্ডবগণের সন্তানগণকে নিধন করতে সমর্থ হয়। এই ঘটনাটি মহাভারতে যে ভাবে লিপিবদ্ধ আছে তা থেকে এই অনুমানটি সঙ্গত হয়ে পড়ে যে অশ্বত্থামার সঙ্গে পাণ্ডব-শিবিরে সেই নিশীথ রাত্রে শিবের অনুচর ভূত ও রাক্ষসগণ এই হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে। এই সকল সংঘাত হতে প্রমাণ হয় যে অনার্য্যদের সঙ্গে তাদের আর্য্য আত্মীয়েরাও যোগদান করে। ভারতীয় ইতিহাসে শৈব ও বিষ্ণু উপাসক এই দুইটি রাষ্ট্রীয় দলের মধ্যে প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। আর্য্যেরা শিক্ষা সংস্কৃতি ও রণনীতিতে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেও জনমানসে শিবের আসন অক্ষুণ্ণ ও অটুট রয়ে গেছে। শিব নিম্নস্তর থেকে সমাজে আর্য্যদেবতাগণের সমাজের সহিত সম্মানের আসন লাভ করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের শিব পূর্ব্বভারতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের নিকট পূজিত। শিব ভারতের যোগীসন্ন্যাসীগণের দেবতা, মন্দিরে মন্দিরে সন্ন্যাসীরাই প্রধানতঃ শিবের উপাসক।

ভারতীয় গণজীবনকে ব্রাহ্মণেরা বর্ণাশ্রমী সমাজের কাঠামের অভ্যন্তরে আনতে পারেন নি। যদিও সে চেষ্টা তারা অনবরত করেছেন। বর্ণাশ্রম আর্য্যদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণেরা ভারতের অনার্য্য রাজশক্তিকে ক্ষত্রিয়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে বর্ণাশ্রমী কাঠামকে অব্যাহত রাখার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন। অনার্য্য রাজন্যবর্গকে আর্য্যজাতির সঙ্গে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে অজস্র পুরাণ কাহিনী ও আখ্যায়িকা রচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা নানা উপায়ে ক্ষাত্রবলের সাহায্যে শিব উপাসক সন্ন্যাসীদের সমাজ বহির্ভূত জীবনযাপনে বাধ্য করে রাখলেও জনগণের নিকট এই শিব উপাসক সন্ন্যাসীদের সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকে যায় এবং এখনও আছে। ইহারও ঐতিহাসিক কারণ আছে। উত্তর ভারতে বিজিত জাতির উপর আর্য্যদের নির্য্যাতন কম হয়নি। এই সময় প্রাচীন শৈবধর্ম্ম রক্ষা করে সন্ন্যাসীরা পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় নিয়ে শৈব চিন্তাধারায় সমন্বিত যোগসাধনাকে রক্ষা করেছেন। রাষ্ট্রীয় নির্য্যাতনে পাশ্চাত্যজগতে পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্টীয় সাধকেরা এইভাবে ধর্ম্ম-যাপনের জন্য বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইউরোপের hermit ও anchoriteগণ এই শ্রেণীর সাধক ও তপস্বী। ভারতবর্ষে এই জাতীয় অরণ্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীদের উদ্ভব হয় বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে। সমাজজীবন পরিত্যাগের ফলেই সন্ন্যাসীরা বিরলবসন এমন কি নগ্ন হতেও বাধ্য হন। এই নগ্নতাকে তারা সাধনার অঙ্গ বলে গ্রহণ করে আত্মসন্তোষ লাভ করেন। আর্য্যদের বর্ণাশ্রমের কাঠামের অভ্যন্তরে যে সন্ন্যাসের কথা পাওয়া যায় তা চতুরাশ্রমের শেষ পর্য্যায় মাত্র। আজীবন সন্ন্যাসের স্থান সেখানে নেই। আজীবন সন্ন্যাস প্রথমতঃ শৈবসন্ন্যাস রূপেই বনাঞ্চলে আশ্রিত ও রক্ষিত হয়।

বেদাচারী ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের কাঠাম ভারতের ইতিহাসে ভেঙে পড়তে দেখা যায় বৌদ্ধধর্ম্মের

সংঘাতে। বৈদিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত সমাজজীবনে বুদ্ধদেবের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে অভূতপূর্ব্ব গণজাগরণ ভারতবর্ষে সম্ভব হয়েছিল বৌদ্ধযুগে। ভারতে বৌদ্ধবিপ্লবের ফলে সুরু হয় নূতন সংস্কৃতির এক গৌরবময় অধ্যায়। বুদ্ধদেব যে করুণাধর্ম্ম প্রচার করেন সেই ধর্মের ছায়াতলে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অসংখ্য জনসেবক ও সেবিকা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরূপে।

কত নির্য্যাতিতা নরনারী সঙ্ঘের আশ্রয়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীরূপে সমাজসেবায় তাহাদের জীবনকে সার্থক করেছিলেন তার প্রমাণ তারা পালিসাহিত্যে রেখে গিয়েছেন। এই বৌদ্ধ শ্রমণ ও পরিব্রাজকেরা যোগ-সাধক সন্ন্যাসী ছিলেন। তারা ছিলেন সমাজসেবক ও সেবিকা। বৌদ্ধধর্ম্ম যে রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লব আনয়ন করে তার ফলে সমাজজীবনে শৈবসন্ন্যাসীগণের পুনরাগমনের সুযোগ ঘটে। বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িককালে মহাবীর যে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মবিরোধী। শৈবসন্ন্যাসের প্রভাব জৈন তীর্থঙ্করদের উপর রয়েছে, কিন্তু পৌরাণিক দেবদেবীদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি, তাই বৌদ্ধধর্ম্মের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা তাদের পক্ষে অর্জ্জন করা সম্ভব হয়নি। ব্রাহ্মণেরা আত্মরক্ষার জন্য বৌদ্ধরাজন্যবর্গকে সমর্থন করতে বাধ্য হন। গণজীবনের উপর ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অপচীয়মান প্রভাবকে রক্ষা করার জন্যে সন্ন্যাসীদের শৈবাচারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। অর্থনৈতিক কারণে তৎকালে ইহা এক অনিবার্য্য অবস্থা। যোগাচারের সাথে ব্রাহ্মণদের এই সংযোগের ফলে সমাজে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রাক্‌আর্য্যযুগের শিব-উপাসনার পুনর্জ্জাগরণ ঘটে। ব্রাহ্মণেরা অকুণ্ঠভাবে শিবের উপাসক হয়ে উঠেন। তান্ত্রিক আচার বৌদ্ধযুগের শেষার্দ্ধে বৌদ্ধেরাও গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই সময় সুরু হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান। এটা সম্ভবপর হয়েছিল সুঙ্গবংশের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের ফলে। যোগশাস্ত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি ছিলেন পুষ্যমিত্রের মন্ত্রী। ইহার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ শৈবধর্ম্মসমর্থিত যোগশাস্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এর পশ্চাতেও রয়েছে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কারণ। গণমানসের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপনাকে রক্ষা করতে পারে না। মহাযানী বৌদ্ধেরা এইজন্যই আত্মরক্ষার জন্য শৈব সন্ন্যাসের ব্রাহ্মণ্যসমর্থিত তান্ত্রিক আচারকে গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার বা নূতন সংস্করণ সম্ভব হয় শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে। শঙ্করাচার্য্য ছিলেন শিব-উপাসক ব্রাহ্মণ। তিনি শিবের অবতার বলে পূজিত। ব্রহ্মবাদী ঋষির ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করে তাহা দ্বারা হয় বেদান্তধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ-বিরোধী। তাহার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ও শৈব-সন্ন্যাসের। এই বিখ্যাত ধর্ম্মগুরু যখন ভারতের জনজীবনে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের বৌদ্ধ পালরাজাগণের তখন অবসানের যুগ। উত্তরভারতে সমাজজীবনও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সমাজ-জীবনে শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে শৈব-সন্ন্যাসের অনুকূল থাকায় ব্রাহ্মণ্যের ব্রহ্মবাদ ও শৈব-সন্ন্যাসের যৌগিক আচারের মধ্যে একটি সহযোগিতা ঘটে।

শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক যুগে বা তাহার অব্যবহিত পরে লক্ষ্য করা যায় যে ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের গুরু বা উপদেষ্টারূপে সন্ন্যাসীরা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছেন। শঙ্করাচার্য্যের নিস্পৃহ ত্যাগের আদর্শ সন্ন্যাসীগণকে অনুপ্রাণিত করে এবং তারা সমাজকল্যাণের জন্য পরোক্ষভাবে রাজধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করেন। যোগশাস্ত্র ও যৌগিক প্রণালী অবলম্বনক্রমে অধ্যাত্মশক্তি অর্জ্জন করে সমাজ-জীবনকে চালিত করতে পারা যায় এ বিশ্বাস তাদের পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে। সাক্ষাৎভাবে শঙ্করাচার্য্যের দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গণ বৌদ্ধধর্ম্মের সমাজসেবার আদর্শকে পরিহার করে চলেছেন। এমনকি আধুনিক কালেও তাদের দ্বারা রামকৃষ্ণ মিশনের জন-সেবক সন্ন্যাসীগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে নিন্দিত হয়েছেন।

শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার অন্ধযুগ (Dark age) এই সময়েই ঘটে মুসলমানদের ভারত আক্রমণ। এক শতাব্দীর মধ্যেই মুসলমানেরা উত্তরভারতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। বৌদ্ধদের যে সকল বিহার ও মঠ তখনও সমাজের বুকে বর্ত্তমান ছিল ও সমাজ-জীবনে যে সকল বৌদ্ধ উপাসকেরা বাস করতেন তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতো। মুসলমানেরা সে সকল বিহার ও মঠের উপর আঘাত হানতে আরম্ভ করেন এবং নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে সে সকল বিহার ও মঠকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। মহাযানী বৌদ্ধাচার সে সময় সমাজে গুপ্তভাবে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে আচরিত হ'তে থাকে। এই সময় বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের মধ্যে ভেদও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। বুদ্ধদেব শিবত্ব লাভ করেন। শিব ও বুদ্ধ এক হয়ে যান।

বাংলাদেশের চর্য্যাপদগুলি এই সময়ের গোপনীয় সাধনমার্গের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসঙ্গীত। ইহার ভাষা সাঙ্কেতিক। সিদ্ধাচার্য্যগণের এই সকল রচনা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই অস্পষ্ট। রাষ্ট্রীয় নির্য্যাতনের ফলে সমাজের যে ভয়াবহ অবস্থা সে সময় নির্য্যাতিত জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম রক্ষাকল্পে এই উপায় অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ভারতবর্ষের গণ-মানস গঠিত হয়েছে বিভিন্ন মানব-সভ্যতার সঙ্গমতীর্থে। মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের পর মোস্লেম সাধকেরাও এখানে তাদের শরিফতি সাধনার ধারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বৈষ্ণবদের সাথে ঘটেছে সুফীদের মিলন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজয়ী মুসলমানেরা যখন প্রাধান্য বিস্তার আরম্ভ করেন সেই সময় গৌড়বঙ্গের সামাজিক জীবনের এক শোচনীয় অবস্থা। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনা সমাজ-জীবনে বিজয়ী মুসলমানদিগকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ। তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ মহাযানী আচার তখন নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান ও বহু ক্ষেত্রে কদর্য্য অমানুষিক বীভৎসতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। এই পঙ্কিল ও ঘৃণিত জীবনযাত্রা থেকে মুক্তির বার্ত্তা নিয়ে আসেন বাংলার শ্রীচৈতন্য। বাংলার সমাজ-জীবনে সঞ্চারিত করে দেন জীবনীশক্তি। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা সে করুণার ধর্ম্মকে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্য সমাজে নতুনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে এই দুর্দ্দিনে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে সমাজ-জীবনকে পঙ্কিল কামাচার থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন। চৈতন্য কেবল ভক্তির উদ্বেলতা দিয়ে বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দেননি। মুসলিম সভ্যতার সঙ্গে

হিন্দুসভ্যতার সংঘাতের যুগে তিনি হিন্দুজীবনে করলেন এক উদার আদর্শের ও বীর্য্যের প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যের জীবনের এই দিকটা আজ বিস্মৃত ও উপেক্ষিত। পৌরুষহীন এক দুর্ব্বল ভাবালুতার মধ্যে চৈতন্যের দীপ্তিময় জীবনাদর্শ বিলুপ্তপ্রায়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের এই ঐশ্বর্য্যের দিকটা প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতি ভারতবর্ষে শৈব বৈষ্ণব বৌদ্ধ ও মুসলিম গুরুবাদকে আশ্রয় করে ভারতের জনজীবনে এখনও বেঁচে রয়েছে। এই সমস্ত সাধনা ধারার সমন্বয় ঘটেছে জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে বাউলদের সাধনার মধ্যে। দুঃখের অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে বাস্তব জীবনে মানবাত্মার প্রিয়কে লাভ করার যে অনন্ত অভিসার ইতিহাসের পথে চলেছে তা-ই যেন সার্থক হয়েছে বাউলদের সাধনার মধ্যে।

ওরে নিঠুর দরদী
তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে—

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে বিশ্বানুভূতির কেন্দ্রগত ভাবরূপ বা রসরূপ এই বাউলদের 'মিলন বিরহের বেদনা বন্ধুর পথে' চরম পরিণতি লাভ করেছে—তার জীবনদেবতার 'নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষা সম'

সকল দেশের সকল ফুল
এক সূর্য্যের আলোকে চির স্বীকৃত
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি
যে মানুষের অতিথি শালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জ্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে—
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী তারা মৃত্যুঞ্জয়
তারা আমার অন্তরঙ্গ আমার স্বধর্ম, আমার স্বগোত্র
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা—
দেশ বিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে—

* * *

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত
আমি ত্রাতা, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হলো
দেবলোক থেকে
মানব লোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই যে স্বর্গ মানবীয় মিলনতীর্থের ভাবরূপ ফুটে উঠেছে তা মানব জাতির ভাবীকালের নাগালের বাইরে নয়। রবীন্দ্রনাথ মানব জাতির দিশারী পথিক। সমাজ-জীবনের আড়ষ্টতা অচলায়তনকে তিনি মানস-জীবনে ভেঙে দিয়ে প্রগতিশীল করে রেখেছেন, তবুও দুঃখ এই আমাদের সমাজ-জীবন দেখছি এক পুনরাবৃত্তির মোহগর্ত্তে পতিত হয়ে গতানুগতিকতার মধ্যে শান্তিলাভের চেষ্টা করছে।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ভারতীয় সমাজজীবনকে টানছেন মধ্যযুগের দিকে। এরা হরণ করে নিচ্ছেন যুবমনের নতুন সৃষ্টির আগ্রহ ও শক্তিকে। দেহমনে সৃষ্টিশীলতা যৌবনের ধর্ম্ম, এই যৌবনই সমাজে গতিবেগ সঞ্চারিত করে ভাবীকালের পথে। সন্ন্যাসীদের প্রভাব করছে এই যৌবনধর্ম্মের প্রতিকূলতা। গতানুগতিক ধর্ম্মীয় আচারের নির্বিচার পুনরাবৃত্তি চলে আসছে হাজার বছর থেকে পরাধীন ভারতের সমাজ জীবনে, এই রোমন্থন একটা চিন্তাহীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আমরা তাই এক মানসিক উদ্যমহীন নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় জাতি। আশা নাই, উৎসাহ নাই, বাঁচতে চাই দৈবী উপায়ে। গুরুমন্ত্রে যেতে চাই স্বর্গলোকে। অভ্যাস-সঞ্চিত জড়মনে আছে একটা বাসনাসক্তি, নৈতিক শক্তি সজীবতা তেজস্বিতা অপগত। এই অবস্থায় বিজ্ঞানের তপস্যা ও সাধনার আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের দেশে থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যের প্রভাবে ব্রিটিশযুগে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে যে সজীবতা ও বিজ্ঞানানুরাগের পরিচয় আমরা পাই, তার গতিও মন্থর হয়ে আসছে, দেশ যেন আবার ঢলে পড়েছে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের মোহময় আরামের কোলে। গতানুগতিক পথে চলার মধ্যে আছে এক নিরাপদ নিশ্চয়তা। দুর্জ্জয়কে জয় করার দুঃসাহসের মধ্যে রয়েছে যে জীবনের পরিচয় যার ফলে পাশ্চাত্য দেশ আজ জাগতিক জীবনের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেছে, সে জীবনের স্পন্দন সন্ন্যাসীদের প্রভাবে এখন বিলীন হতে চলেছে। দিল্লীর বুকে হচ্ছে পতিপুত্রার অনুষ্ঠান, সন্ন্যাসী সাধুদের আশীর্ব্বাদ এনে দিচ্ছে স্বর্গীয় সুখ স্বচ্ছন্দতার মোহময় আশ্বাস। সহরে সহরে পল্লীগ্রামের পথে চলেছে সন্ন্যাসীঠাকুরদের পারলৌকিক মুক্তির জন্য মন্ত্রদীক্ষার অভিযান। যাদুমন্ত্রে

অপহৃত হচ্ছে সুপরিকল্পিত উপায়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তা, এককালের বিজ্ঞান সাধক ও চিকিৎসকদের গলায় উঠছে তুলসীর মালা, কপালে পরলোকের পাথেয় ফোঁটাতিলক। ভারতীয় সংবিধানে এসেছে গণতন্ত্র রিপাব্লিক, পতিপুজারিণী নামহীনা মেয়ে আর ব্যক্তিস্বাধীনতা—বঞ্চিত নির্জীব পুরুষদের জন্য। এ এক বিরাট পরিহাস শুধু নয়, এতে রয়েছে গণতন্ত্রের আশু বিপদের ইঙ্গিত। সমাজতন্ত্রের অভিনয়ে পট-পরিবর্ত্তিত হলেই আসে ফ্যাসিজম ও সর্ব্বাত্মক কমিউনিজমের মধ্যে সংঘাত ও অন্তর্বিপ্লব। ইতিহাস হয়ত এরই অপেক্ষায় আছে।

বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সমাজজীবনে ভাবীকালে শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে। অর্থনৈতিক জীবনেও কোনরকমের কোনো শ্রেণী থাকবেনা। এই সময়ে গণসংস্পর্শে এসে যদি সন্ন্যাসীরা মধ্যযুগের সংকীর্ণতায় পথে ভারতীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে পরিচালিত করেন তাহলে তাদেরকেও এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হবে।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এমন কি বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতি বিরূপতা পরিহার করে বৈজ্ঞানিক ও সংস্কার বর্জ্জিত মনোভাব নিয়ে মানুষকে যদি তারা ভালো না বাসেন একটি বিশ্ব সমাজ গঠনের আদর্শে সংগঠিত না করেন তা হ'লে বাষ্টি মানুষকে স্বর্গের প্রলোভনে বিভ্রান্ত করে তারা বেশীদিন চলতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে আচার ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের বাইরে বা উর্দ্ধলোকে স্থাপন করেছেন। তাই তিনি নিজেকে বলেছেন 'আমি ব্রাত্য মগ্ন বঞ্চিত। এখানেই জীবনের Dynamism বা নির্বাধ প্রগতিশীলতা। আচার অনুষ্ঠান দিয়ে মানুষের আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে রাখা এ যুগে আর সম্ভব নয়—

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানেনা—

বন্ধ্যা রাত

বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী

শুষ্ক হৃদয় ; কে জানে কোথায় ডাকছে কেউ।
কালো রাত্রির আড়ালে-আড়ালে কে-গো পথিক
কেন এলে তুমি ? চিন্তার-তটে লেগেছে ঢেউ,
চোখঠারে মন : ঘুমাও, এ-সব কাল্পনিক।

ঘুমাও-ঘুমাও, যদি স্বপ্নের সাত-আকাশ
রামধনু আঁকে তাকেই সত্যি মনে করে,
ভুলে যেও তুমি জাগতিক যত দীর্ঘশ্বাস
(হায়রে এখনও জাগার কথাই মনে পড়ে)।

নিদ-হারা রাত ; চোখে ভাসে শুধু ছায়া-মিছিল।—
কারা যেন আসে, কী দাবী তাদের ভেবে-না পাই !
তবু মন তুমি একটু দাঁড়াও, দিও-না খিল্ ;
কে যেন এসেছে, বুঝি-নি এখনো, বুঝতে চাই।

সময়-প্রহরী আনাগোনা করে। কিন্তু কৈ—
সে-তো আসেনিকো, আঁধারে আমার ধরে-নি হাত।
চেয়ে দেখি পথে ধূ-ধূ নির্জ্জন, কেউ-তো নেই,
পায়ে-পায়ে শুধু এগিয়ে চলেছে একলা রাত।

তোমাকে

অরবিন্দ ঘোষ

আশ্চর্য তোমাকে দেখি আবেগ-বন্যায় টলোমলো
শ্রাবণী মল্লারে আর নবান্ন-স্বপন বোনা মাঠে,—
হেমন্ত-প্রত্যাশা নিয়ে সুগহন ব্যথা-ছলোছলো
মেঘের সম্ভারে দেখি নিরুদ্ধ কামনা-দিন কাটে।

তোমার সত্তাকে ঘিরে আমার স্বপ্নের দীপ জ্বলে,
উদ্ভিন্ন প্রকাশ তুমি পান্নাঘন মাটির সবুজে ;
কৃষ্ণচূড়া-রাঙা রোদ আমাকে মাতাল করে তোলে,
প্রদীপ্ত যৌবন নিয়ে ফিরেছি তোমায় খুঁজে খুঁজে।

তোমার করুণা ব্যাপ্ত—সোনামুখী-ধানে তার রেশ,
পলাশ-মহুয়া ঘেরা হে আমার সুধন্য স্বদেশ ॥

মন-বিহঙ্গী

সুগেন মুখোপাধ্যায়

হয়নিকো শেষ রাত্রি তখনো, জানলার কাছে এসে
ডাক দিয়ে গেল ক্রৌঞ্চমিথুন ;
তন্দ্রার ঘোর কাটেনি তখনো : ভাবনার পাখী ডাকে,
হাল্কা হাওয়ায় স্বপ্ন-বাদুড় উড়ে গেছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

সারা দুনিয়ার আলোর খবর :—ঘড়ি টিক্ টিক্ নড়ে,
মনের-ই গভীরে বিজনে শব্দ ;—পাখা পত্‌পত্‌ করে।
শরীর-শিয়রে বিসুবিয়াসের ধোঁয়ার ধূসর বুকে
কান্না রেখেছে জঠরের লাভা দূর দুরান্ত থেকে।

রামধনু-ছেঁড়া আলোর কন্যা বলেছে কোকিল সুরে :
এখানে রাত্রি কাল নেমে যাবে, চলো গোলার্ধ ছেড়ে।
রামধনু নয় ;   অগ্নিপুচ্ছে ধূমকেতু মনে হয় ;
পুবালী হাওয়ায় কি যেন শুনেছি ?   তবে কি রাত্রি নয় ?

ঘোড়ার পিঠেতে প্রসূতি তরুণী—মরুবৃষ্টির মেয়ে
সুমুখের দিকে শুধুই ছুটেছে, কেবল-ই সামনে চেয়ে।
অশ্বের খুরে আমার পৃথিবী ছিঁড়ে যাবে অবশেষে,
হয়ত সেখানে আর্তেজী কূপ দাঁড়াবে অট্টহেসে।

সমুদ্র-সেঁচে সূর্য-মুক্তি : পৃথিবী স্বপ্নময়,
আকাশ পাঠাল ক্রৌঞ্চমিথুন ;—মন-ও বিহঙ্গী হয়।

হৃদয়-বিকেল-কবিতা

পরিমলভদ্র বিষ্ণু

একটি হৃদয় এখনো রয়েছে চেয়ে
আঙুরের মত চোখ তুলে দেখ মেয়ে।
একটি হৃদয়ে হলুদের আলপনা,
আরতি জানায় তোমায় সুরঞ্জনা।

একটি বিকেল তোমায় সাজাবে বলে
প্রহর-গণিছে কতকাল পলে পলে।
একটি বিকেল সার্থক কর তুমি
ভ্রমরের মত ফুলের বুকেতে চুমি।

একটি কবিতা কান্নায় ভিজে ভিজে,
প্রণতি জানায় তোমায় ও মনসিজে।

সোনার গারদ

মানব গঙ্গোপাধ্যায়

"বৌমা চপ্‌টা বেড়ে পাকিয়েচে, গিন্নী"—হারাণীর স্বামী কাঁচের গ্লাসে হাত চোবালেন। "চপ্‌ কাটলেটে বৌমার হাত ভাল খোলে"—বলল হারাণী। অন্য সময় হলে বলত, না, লবণ আর একটু টান হোলে যেন ভাল হোত। কিংবা ফুলকপিটা যদি আরেকটু বেশী ভাজা হোত স্বাদটা জিভে লেগে থাকত, নতুবা কিস্‌মিস্‌ অতো দেওয়া ঠিক নয়, জিনিষ বেশী দিলেই কি রান্নার স্বাদ বাড়ে? বৌমা নতুন শিখেচে, অমন নতুন নতুন সবারই হয়; আস্তে আস্তে শিখবে, এখনও ছেলেমানুষ তো, রান্নার কি-বাই বোঝে। অর্থাৎ এমনি কিছু বলতই। আজ বলবে না। কার জন্যে বলবে? স্বামীর পর আক্রোশ মনের কাণায় কাণায় ভরে উঠেচে। কেন বলবে? স্বামীর মন রাখতে কেন চাইবে? কি স্বার্থপর, কি জঘন্য লোক। নিজের স্বার্থ চিরকাল দেখল। অমন প্রাচীনপন্থী লোক ভূভারতে আর কেউ দেখেনি। অথচ ওকে নিয়ে হারাণী একটা জীবন কাটিয়ে দিল।… নিজের দিকে তাকাল না। হারাণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। নিজেকে কেবল বঞ্চনা করে গেল। নিজেকে উপবাসী রেখে এদের পেট ভরিয়েচে। তবু এদের তৃষ্ণা মেটে না। যত পায় তত চায়, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে স্বামী-সংসারকে আনন্দ দিয়েচে—তার মর্ম কেউ বোঝে না।……হারাণী ভাবে, খারাপ লোক বুড়ো বয়সে ভীমরতি হলে বোধ হয় দু' একটা ভাল কাজ করে কিন্তু,…তাকে কষ্ট দিতে কারো কোন ভুল হয় না। মানুষের ভুল হয় কিন্তু হারাণীকে কষ্ট দিতে ভুল হয় না। আশ্চর্য্য সংসার! এদের মধ্যে জীবন খরচ করা জীবনের অপচয় মাত্র। হারাণী ভাবে জীবনকে শুধু মাত্র বাজে খরচ করচে।……তাই বৌর রান্নার প্রশংসাই করবে হারাণী। কি হবে এ সব নেমক-হারামদের কাছে নিজের রান্নার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। উপকার ফুরিয়ে গেলেই উপকারীকে ভুলে যেতে এদের একটুও বাধে না। আশ্চর্য্য, একবার বলতেও তো পারত; তোমার মত এমন রান্না এরা কেউ এখনও করতে পারে না—এরা তো সবে ঠেকে ঠেকে শিখেছে। বলতে পারত না একথা? বললে মিথ্যে হোত? আশ্চর্য স্বার্থপর সব! যৌবনের অত্যাচার সহ্য করেচে, তখন সহ্য করবার বয়েস ছিল। কিন্তু এখন বয়েস হয়েচে, এখন আর সহ্য হতে চায় না। সহ্যেরও মাত্রা আছে। বয়েস হয়েচে……ছেলে, বৌ, নাতি হয়েচে, এখনও কেন? এখনও কি একটু উদার হতে নেই? এখনও বাড়ী হতে বেরুতে দেবে না। হারাণী আঁচ করেছিল ঠিকই। বড় বৌ যখন এসে বলল, "মা আপনার ছেলে আজ বাড়ীর সবাইকে নিয়ে ষ্টার থিয়েটার যেতে চায়—আপনাকে কিন্তু যেতে হবেই।"

হারাণী মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলছিল, "ওমা আমি বুড়ো মানুষ কি যাব—তোমরা ছেলেমানুষ সাধ-আহ্লাদ করবে—আমাকে আবার কেন?"

বড় বৌ বলেছিল, "সেকি হয় মা? প্রহ্লাদ তো ঈশ্বরের কাহিনী। আপনার ছেলে বলছিল, বেশীর ভাগই বুড়ো মানুষ যায়। আমি বললুম, মাকে তাহলে নিতেই হবে। এসব

ঠাকুর দেবতার কথা মা শুনবেনা তা কি হয়। সারা জীবন তো ঘরেই কেটেচে। চলুন মা, কপড় ছাড়ুন।"

যদিও হারাণী বুঝতে পেরেছিল নতুন ছোট বৌ যাতে শাশুড়ীর বেশী প্রিয়পাত্র না হতে পারে তার জন্যেই অমন গায়ে-পড়া আদর দেখানো। তথাপি হারাণী নিজেকে বুঝিয়েছিল, বড় বৌ মাঝে মাঝে সত্যি কথাও তো বলে। আর নতুন বৌ, তো হোক না বড় ঘরের মেয়ে—একবার তো ডেকেও বলতে পারত, কেবল চপ্ কাটলেট বানিয়েই শ্বশুরের মনজয় করবার চেষ্টা……গভীর জলের মাছ! বড়বৌ এমনিতে একটু রাগী হলেও মনটি সাদা। আর বড় বৌই বা বলবে কেন? যার চোখ আছে, সেই দেখতে পায়। কেন ৭ নম্বর বাড়ীর মেজ জা বলেনি ওকে, সে কি ঘরের লোক?

হারাণী বলেছিল বড় বৌকে "দেখো, তোমার শ্বশুর কি বলেন।……আমার কিন্তু না যাওয়াই… তোমরাই যাও। তোমরা ছেলেমানুষ, হৈ চৈ করবে……আমি বুড়ো মানুষ……তোমরা অসুবিধেয় পড়বে।"

"ইস্, মার যেমন কথা। আমরা সব কচি খুকী কি না? আর আপনারই বা এমন কি বয়েস? সেদিন আমার মাসী বলছিল, যাই বলিস রমা, তোদের ছুটি বৌকেই তো দেখলাম। কিন্তু আপনার নাম করে বলল, তার চেহারার কাছে তোরা কেউ দাঁড়াতে পারিসনে। আমি বললুম, তাও তো তেমন যত্ন করে থাকেন না।……আপনার কিন্তু মা যেতেই হবে।"

"তুমি এমন করে ধরতে পার বৌ, না বলার জো নেই। দেখো তোমার শ্বশুর কি বলেন।"

বড় ছেলে, বড় বৌ, হারাণী তিনজনে এল হারাণীর স্বামীর কাছে। তিনি বললেন। তাঁর চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার ধরণ দেখেই হারাণী বুঝল স্বামীর আমতো আমতো ভাব।

স্বামী বড় ছেলেকে বললেন, "তোর মাকে নিয়ে যেতে চাস্…। বাসার সবাই মিলে গেলে… ঠাকুর চাকরগুলো তো একা থাকবে।……তোর মার আবার যদি…ঠাণ্ডা লেগে জ্বরটর না হয়। ……নিয়ে যেতে চাস নিয়ে যা।"

হারাণী বললে, "বাসায় হীরু থাকল, তুমি থাকলে। তালা দিয়ে যাব। তাও ঘণ্টা কয়েকের জন্যে। এর মাঝে এমন কি চুরি হয়ে যাবে? ঝিও তো যাচ্ছে ওদের সঙ্গেই।……আর একটু ঠাণ্ডা লাগলে আমার সর্দিজ্বর হয় না। এই স্বাস্থ্য শরীর নিয়ে তো ভিজে কাপড়ে তোমাদের ঠাকুর দালানে পুজোর জল দিয়েচি, আয়োজন করেছি দশ বছর, জ্বর হয়নি। কই, সেদিন তো একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করনি! যেতাম না ঠিকই……কিছুতেই না। শুধু তোমার মন পরীক্ষা করলাম। আমি বুঝিনে, এখনও তোমার অমত কেন?"

"অমত? অমত আমার কোথায় দেখলে? অমত করল কে?"

"তোমার স্বভাব। দেখলে বৌমা তখনই বলেছিলুম। কোনদিন ঘর থেকে বের হইনি। তোমাদের মত অদৃষ্ট নিয়ে আসিনি। জন্মেচি সেকেলে। দুঃখ করে লাভ কি? তোমরাই যাও।"

চলে গেল ওরা। ছোট বৌর চপ্ হীরু ঠাকুর দিয়ে গেল। সামান্য ঝি শচীরও যতটা স্বাধীনতা আছে, হারাণীর তা নেই।

ওরা চলে গেলে হারাণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলল। আজকাল কি হয়েছে, কাঁদলেও বুকের ভার হালকা হয় না। বার্থ ক্রোভেও অন্তরটা কেবল জ্বলতে থাকে। জীবনটা অযথা বাজে খরচে নষ্ট হয়ে গেছে হারাণীর। কেঁদেও লাভ নেই, না কেঁদেও শান্তি নেই। চোখের জল মোছে হারাণী।

কিছুক্ষণ পর এল স্বামীর কাছে। দেখলে, স্বামী আফিমের নেশায় ঢুলছে। আরো যেন রাগ বেড়ে গেল হারাণীর। একজনকে যে আঘাত করল তাতে কতটা ব্যথা সে পেতে পারে তা নিয়ে কোন চিন্তা না করে আফিমের নেশায় ঢুলচে। যাকে আঘাত দিল তার সম্পর্কে চিন্তা করেও তাকে মর্য্যাদা দিতে চায় না। সে যেন কিছুই নয়। এ নিয়ে যেন ভাববারও কিছু নেই। এতটুকু অনুতপ্তও হতে চায় না। পাথরের হৃদয়।……নিজে সে চপ্ খেল, স্ত্রী খেল কিনা একবার জিজ্ঞাসাও করল না।…তাই আজ বৌর প্রশংসা স্বামী যখন করল, হারাণী সায় দিয়ে গেল। অন্য দিন হলে নিজের রান্নার পারদর্শিতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে তবে ছাড়ত; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে দীর্ঘশ্বাসও ফেলত, বেইমান, এদের জন্য এত করেচি, একবার মুখ ফুটে বলেও না। আজকের দিনের লোভই এদের কাছে সব। আজ বলবে না। আজ বৌয়ের প্রশংসাই করবে হারাণী।

হারাণীর কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি হতে থাকে। ইচ্ছে করে খুব করে স্বামীর খোষামোদ করে, স্বামীর জুতোর তলায় নিজেকে পীষে মারে। স্বামীর সব কথায় সায় দিতে যেতে ইচ্ছে করে। স্বামী যদি ওকে গুন করে তবে যেন ওর ইচ্ছার পেটভরে। এমনি করেই ওর নিজের প্রতি ও স্বামীর প্রতি প্রতিশোধ নিতে চায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল পনর মিনিট। নির্বোধের তোষামোদী করলে মুখে কদর্য্যতার যে তৃপ্তি ফুটে ওঠে, তবে একটা অদ্ভুত প্রতিশোধ আনন্দ অপেক্ষা করে হারাণী। চুপ করে রইল পনর মিনিট। তারপর বলল, "আজকাল বৌরা স্বামীর জন্যে কত করে যত্ন করে সব বানায় কেন জান? তাদের স্বামী তাদের ভালবাসে। সুখ দুঃখের কষ্ট বোঝে, স্ত্রীকে আনন্দ দিতে চায়।"

স্বামী ভীতভাবে স্ত্রীর দিকে তাকায়।

হারাণী বলতে থাকে, "সত্যি কথাই, আমরা তোমাদের জন্যে অতো করিনি। আমাদের সাধ আহ্লাদ বলে তো কিছুই ছিল না। তোমাদের দাসী ছিলুম। তোমাদের দেখতে হোত দশহাত ঘোমটার তল থেকে স্বামীকে পরিষ্কার দেখা যায় না।…তোমার মায়ের কথা না শুনলে বাপের বাড়ী রেখে আসতে। তুমি ছিলে তোমার মায়ের এক সন্তান—এই-ই ছিল তোমার পরিচয় তুমি তোমার স্ত্রীর স্বামী ছিলে না—ছিলে শাশুড়ীর সন্তান। তাই তোমাদেরও আমরা প্রাণ খুলে সেবা করতে পারিনি। তোমরা আমাদের প্রাণের ঘোমটা খুলতে পারনি।" শেষের দিকে হারাণীর স্বর ভারী হয়ে আসে। চোখে জল আসে। আশ্চর্য্য এতগুলো মিথ্যা কথার প্রতিবাদও করলে না হারাণীর সব কথা সত্যি বলে ধরে নিল। স্বামীর সেবায় সমস্ত জীবন নিজেকে উপবাসী রেখে

দিল। স্বামী কি বলতে পারত না, তোমার মত সেবা কোন মেয়েই তার স্বামীকে করতে পারত না। আজকালকার মেয়েরা তো নিজেদের সাজ পোষাকেই ব্যস্ত, তাঁরা তাদের স্বামীর কোন খবর রাখে? আশ্চর্য্য লোক। চুপ করে সব স্বীকার করে নিল। স্বামীর অসুখ বিসুখে যা হারাণী করেচে তার শাশুড়ী ও শ্বশুরের জন্যে অতো করেনি। বৌমারা তাদের ছেলেদের জন্যে অতো অতো করে না। স্বামী খুসী মনে অনুমতি দেয়নি বলে আজ এই বুড়ো বয়সে পর্য্যন্ত তাকে অমান্য করল না। স্বামী কি আজ একবারও একটি দিনের জন্যেও বলতে পারত না, "তুমি সেবা যত্ন যথেষ্টই করেচ, অন্য কেউ স্বামীর জন্যে অত করে না আমি তোমাকে কোনদিন সুখী করতে পারিনি। তোমার সুখ দুঃখের কষ্ট বুঝিনি। তুমি তো সংসারের জন্যে জীবন দিয়েছ, নিজে কিছু নাও নি।" বলতে পারত না একবার? বললে কি তা মিথ্যে বলা হোত? স্বামী কি বলতে পারত না, তোমাকে তো আমি তেমন ভালবাসতে পারিনি; তবু তো তুমি আমার জন্যে রোজ রোজ জেগে জেগে কত পিঠে, মিষ্টান্ন, চপ কাটলেট বানিয়েছ। কই আজকালকার মেয়েদের না ভালবাসলে তারা কেউ করবে? তুমি অনেক উপরের লোক। আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না।" হারাণীর চোখে জল আসে। আশ্চর্য্য কৌশল লোকটার। চুপ করে থেকে ওর সমস্ত মিথ্যাকে সত্য করে দিল।......হারাণী ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। বৌমা যে শুধুমাত্র যে তার স্বামীর জন্যে চপ বানায়—সেই সংবাদকেও কেমন সুন্দর করে অগ্রাহ্য করে দিল। সত্যি, এদের প্রাণ খুলে যদি সেবা না করত তবে বোধ হয় হারাণী আজ আনন্দ পেত। দশহাত ঘোমটার তল থেকে যদি স্বামীকে না দেখা যেত, তবে বোধ হয় আজ হারাণী দুঃখীত হোত না। ভাবত, একটা বাজে জিনিষ দেখা যায়নি। জীবন......জীবনটা শুধুমাত্র বাজে খরচ করচে হারাণী। সম্পূর্ণ বাজে খরচে গেছে।

স্বামী, গণপতি মুখার্জি, আফিমের মাত্রা চড়ালেন। মনে মনে বললেন, হারাণী হাজার হলেও হরিকিশোর বেদান্ততীর্থের মেয়ে, রাগ হলেই মাথায় যা যা খিয়োরী গজায়। হারাণী কাঁপা গলায় বলতে থাকে, "আজকার ছেলেরা শিক্ষিত, ভদ্র। কথায় কথায় স্ত্রীর গালের উপর চড় মারে মারে না। লাথি দিয়ে সন্তান নষ্ট করে না, মার অনুরোধে স্ত্রীর পর রাগ করে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে না। আজকালকার ছেলেরা অনেক শিক্ষিত।" হারাণী ভাবে, দিক স্বামী তার এই মিথ্যা অভিযোগের উত্তর। কেমন করে চুপ করে থাকে দেখি। হারাণীর মিথ্যাকে যদি সত্যি করে দেয়, তবে হারাণীও স্বামীর মিথ্যাকে সত্য করে দেবে না কেন? আশ্চর্য্য এতেও চুপ করে রইল। এতো অপবাদ মাথায় নিতে একটু ইতস্ততঃ করল না। কেন চুপ করে আছে? কথা বলতে কি ভুলে গেছে? সত্যিই তো হারাণীকে তার স্বামী কোনদিন লাথি মারেনি, দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি, বাপের বাড়ী দিয়ে এলেও লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ রোজ দেখা করচে, স্ত্রীকে আদর যত্ন সত্যই করেচে, শুধু বাইরে বেরুতে দিত না। তা সেকালে বৌরা আজকালকার মত অমন উড়নচণ্ডী ছিল না। স্বামী তো তাকে অযত্নে রাখেনি। তবু তবু লোকটা চুপ করেই জিতে যাবে, ঐ ওর কৌশল। ভাবচে, হারাণী তো জানেই সে মিথ্যে বলচে। তাই আর প্রতিবাদ করচে না। মিথ্যে

বলেচে হারাণী? স্বামী তো মাতাল ছিল, সেকি মিথ্যে? মায়ের অনুরোধে একবার ত্যাগ করতে চেয়েছিল তা কি মিথ্যে? বেশী ঘাটিয়ে লাভ নেই। তা হলে সব বেরিয়ে পড়বে। কেঁচোকে না খোঁচালেই ভাল। তাহলে সাপকে টেনে আনতে হারাণী পারবে।......হারাণী জানলাটা বন্ধ করে চলে যাবার জন্যে দরজায় পা বাড়লে। এতক্ষণে গণপতি মুখুয্যের মুখ খোলে, "বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা··· আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নাও......ঠাণ্ডায় বেরুন......।

বাইরের জগতের কি আকর্ষণই না ছিল ওর কাছে! হারাণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে: সে আজ কত বছর হোল কে জানে, ও আর মেজদি বাগানে যেত আম পাড়তে, বয়েস হয়ত ছিল সাত কি আট···যাত্রা শুনতে যেত,··· ··মাঠে মাঠে দিনে দুপুরে ঘুরে বেড়াতে···পাল্কিতে চড়ে কোথাও যাবার কথা হলে মন আনন্দে নাচতে থাকত—'কত দেখব বাইরের পৃথিবীকে, কত নূতন অচেনা জায়গা।' নূতন মানুষ ঘরে এলে হারাণীর কৌতূহল বেড়ে যেত।

একদিনেই তার কথা বলার অভ্যাস, মুদ্রাদোষ, সবচাইতে কোন কথাটা সে বেশী বলে কেমন করে তাকায় সব মুখস্থ হয়ে যেত হারাণীর। সবাই ওকে বলত ডানপিটে, গেছো মেয়ে। ওর ছেলে সাজতে ভারী শখ ছিল। মা প্রায়ই গল্প করতেন, হারাণীকে নাকি কেউ ছেলে বেলায় কেউ মেয়ে বললে কেঁদে কেটে অনর্থ বাধাত। দার্শনিক বাপ মেয়েকে কখনও কিছুতে ধমক দেননি। রাগ করতে তিনি জানতেনই না।···কত কথা মনে পড়তে থাকে হারাণীর। হারাণী ভাবে, ওর যদি গল্প করার অভ্যাস থাকত তা হলে অমন সুন্দর স্মৃতিগুলো শুকিয়ে মরে যেতে পারত না। মাঝে মাঝে অতীতের গল্প করলে স্মৃতি জীবন্ত মনের বাতাস পেয়ে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। বাপের বাড়ী আশ্রমের মত॥ হারাণী ছিল আশ্রমকন্যা। বাপের বাড়ী এলেই নিজেকে পবিত্র বলে মনে হোত ওর। একা বড় বড় পূজোর নৈবেদ্য, আয়োজন অতি অল্প বয়সেই করতে পারত। সুন্দর করে নাকি কথা বলতে পারত। বাবা ডাকতেন প্রিয়ংবদা বলে। আজ আর কেউ ডাকে না। যারা ডাকত সবাই মরে গেচে। হারাণী ভাবে, বয়েস তো ওদের হয়ে এল। অথচ কিছু হল না। বেড়াতে ওর কি শখই না ছিল? বাবা পণ্ডিত সভায় গেলে হারাণীর সঙ্গে যাওয়া চাই। কবে কোন সন্ন্যাসী যেন একটা যজ্ঞ করেছিল—তাতে একটা ভিজে বেলপাতা পোড়াবার চেষ্টা করেছিল হারাণী—একটু একটু মনে আসে? বাবার সঙ্গে যেখানেই যেত কি আদরই না পেত। জীবন তখন সত্যি অনেক সরল সুন্দর ছিল। হারাণী বুঝতে পারেনা জীবন কি একই রকম আছে, কেবল সেই বদলেচে, না জীবনও পাল্টে যাচ্ছে কালের সঙ্গে সঙ্গে, দুপুর রোদে একা একা মাঠে ঘুরতে কি আনন্দই না পেত বৃষ্টিতে ভেজার শখ কি কম ছিল। অসুখ করত না। আজ এক ফোঁটা জলকে বিশ্বেস করে না। বিশ্বাস করবার শক্তিও নেই। মা মামা বাড়ীতে ওকে না নিয়ে যাক দেখি। দিদিমাকে নিয়ে সেই বুড়ো শিবের বাড়ী থেকে রাত করে ঘরে ফিরতে কি ভয়ই না করত। অথচ ঐ ভয়কেই ভালবাসত সবচেয়ে বেশী।......এসব চৌদ্দ পনর বয়সেরই কথা। ষোলয় পা দিতেই বিয়ে হয়ে গেল। যেমন শ্বশুর তেমনি শাশুড়ী। দশহাত ঘুম্‌টো। বৃদ্ধ শ্বশুর আঙ্গিনায় বসে বসে বৌয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন।

শ্বশুর শাশুড়ীকে ডেকে বলতেন, "বুঝলে বড় বৌ, গনার বৌর অমন পুরুষালী চলন ভাল নয়।"

শাশুড়ী চারিদিকে দেখে আস্তে আস্তে বলতেন, "শুধু কি তাই, খাওয়া কি বাপ, অমন হাঁ মেয়ে-মানুষে করে। মাথায় ঘুমটা তো রাখতেই চায় না। লজ্জা-সরম তো মোটেই নেই। তুমি যতই বল না কেন, বৌমা সুলক্ষণে নয়। দেখে নিও।"

স্বামী ব্যক্তিত্বহীন, বিয়ের কিছুদিন পর হারাণী শাশুড়ীর বিরুদ্ধে কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু স্বামী তক্ষুণি বলে দিয়েছে, মা-বাবার বিরুদ্ধে কোন কথা আমি শুনতে চাইনে।"

স্বামী প্রায়ই মাতাল হয়ে বাড়ীতে আসত, সিদ্ধি খেয়ে বমি করত। গাঁজার আড্ডায় পড়ে থাকত। আর যদি কেউ বলত, কি চেহারা হয়েছে তোর, গনা তোর দিকে তাকান যায় না।"

অমনি শাশুড়ী বলত, "বিয়ের পর থেকেই যা ছিরি হ'চ্ছে।"

হারাণী তখন এসব কথার অর্থ বুঝত না। পরে বুঝেছে,—কি জঘন্য মন। মানুষ অতো ছোট হয় কি করে।

প্রথম প্রথম হারাণী জানত না স্বামী কি খেত। সেই বয়েস পর্য্যন্ত মদের নামই শোনেনি। হারাণী একদিন স্বামীকে বলেছিল, "কি খাও, এসব। খুব খারাপ বোধ হয়। ভয়ানক ঝাঁজ আছে না? মিষ্টি মিষ্টি লাগে? ধক আছে নাকি। কিসের মত খেতে লাগে বলতো দেখি। এসব খেয়ে বুঝি তুমি অমন আবোল তাবোল বক।"

স্বামী সেদিন অনেকটা খেয়েছিল। বল্ল, "কিছু নয়, ওষুধ। বাবাও খায়। দামী জিনিষ খায়। আমি পয়সা পাব কোথায়। খাবে একটু।"

হারাণী বল্ল, "না—না—"—মৃদুস্বরে।

"কিছু হবে না। কিছু না। ভাল লোকের শরীর খারাপ হয় না। আমার মত শরীর হলেই খারাপ হয়। তোমার ভয় নেই……চেখে দেখ না স্বাদটা।"

ও খেয়েছিল অনেকটা।……"মাগো, তারপর যা লজ্জার ব্যাপার। দু' বছরের মধ্যে বাপের বাড়ী যায়নি লজ্জায়। শ্বশুর বলত শাশুড়ীকে "ওগো তুমিও সোমরস পান আরম্ভ করে দাও—বাড়ীটা সুরিখানা হয়ে উঠুক।"

মাতাল শ্বশুর, মাতাল স্বামী, জঘন্য শাশুড়ী……এদের নিয়েই একটা জীবন কেটে গেল। পৃথিবীর কিছুই দেখা হোল না, জানা গেল না। এখনও "ভ্রমণের" গল্প শুনতে ইচ্ছে করে। নিজেকে "ভ্রাম্যমান" ভাবতে ইচ্ছে করে। ভ্রমণের গল্প শুনবার পর একা কিছুক্ষণ থাকতে মন চায়।

শাশুড়ী বাজ পড়ে মরেছিলেন। শ্বশুর মরবার সময় বলেছিলেন, "বৌমা, সংসার তোমার হাতে। গনা ছন্নছাড়া। এ বাড়ী, এ ঘর অনেক কষ্ট করে তুলেচি। তুমি সব রক্ষা করো। তুমি আছ, তাই নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব"……শাশুড়ী মরে যাবার পর শ্বশুর কলকাতায় এসে

এই বাড়ী তোলেন। সেসব অনেক কথা। এ বাড়ীর প্রতিটি ইটের সঙ্গে শ্বশুরের পরিশ্রম মিশে আছে। অনেক আদরে বাড়ী তাঁর। সেসব অনেক কালের কথা।

ঘরে ফিরে এসে স্বামীকে বল্ল, "আচ্ছা, আমাদের কালে আমাদের কোথাও বাইরে যেতে দিতে না, তার কোন কারণ কিছু ছিল? বাইরের জগৎ, বাইরের সংসার, যাত্রাগান, থিয়েটার, তীর্থ সব থেকেই বঞ্চিত করে তোমাদের সেবায় লাগিয়েচ। আচ্ছা, আজ তোমার মেয়েদের, ছেলেদের, বৌদের কেন সব কাজে অনুমতি দাও, কোন কাজে মানা কর না—খারাপ কিছু কর বলচি না বরং ভালই কর—কিন্তু আমি বুড়ি, আমাকে এখনও অনুমতি দিতে চাও না কেন? সত্যি, আমি রাগ বা ঈর্ষা কিছু করি না। বরং ওরা মন খুলে আনন্দ পায় দেখে আমি খুসী হই। শুধু তোমার ব্যবহারের এত পার্থক্য কেন—সেই কারণটা জানতে চাই।"

স্বামী বল্ল, "গেলে না তোমার নিজের দোষে। আবার আমার 'পর দোষ দিচ্ছ। আমার আবার অমত কি? তোমার ছেলে তোমাকে নেবে…।"

"দেখ, যেতে আমি পারতুম। তোমার অনুমতি না নিয়ে গেলেও তুমি আমাকে মারতে না, বাপের বাড়ী পাঠাবার ভয়ও দেখাতে না……কিন্তু যাইনি।" হারাণী গভীর ভাবে শ্বাস নেয়, "তোমায় ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি। আজও করব না। কিন্তু নিশ্চিন্ত জানি, আমার এ ত্যাগের মূল্য তুমি কোন দিন বুঝবে না।……সারাদিন তো বসে থাকো, তুমি তোমার ছেলের সঙ্গে নিজেকে একবার মিলিয়ে দেখত, দেখবে, সবই পাল্টে গেচে।"

হারাণী অন্ধকার বাগানের মাঝে একা একা হাঁটতে থাকে। আকাশকে কত উদার মনে হয়। আজ হারাণীর মনে হয়, আকাশকে ও মন দিয়ে দেখে না বহু বছর। ছেলেবেলায় আকাশ ওকে সঙ্গ দিত, আপনার লোক ছিল। আজ আকাশ পর হয়ে গেচে। বহুদূরে চলে গেচে। আকাশকে আর চেনা যায় না। কত নক্ষত্র চিনত। তাদের কত নাম দিয়েছিল। সব ভুলে গেচে।……ঐ লাল তারাটাই বোধ হয় যাকে ছেলেবেলা হারাণী বলত : লাজুক তারা। চটচট করে লাল হ'য়ে যায়। আশ্চর্য্য এসব কথা ওর মনেও হয়নি বহুদিন।……সেদিন ওর হৈমন্তীদি হারাণীর ছেলেবেলাকার গল্প করছিল। হৈমন্তীদির মুখের গল্পে অদ্ভুত লাগল নিজেকে। নিজের অতীত বোধ হয় ওর মত অমন করে ভুলতে পারেনি কেউ। হৈমন্তীদির মুখের গল্পের ছোট হারাণীর জন্যে অদ্ভুত স্নেহ জেগেছিল হারাণীর। গর্বও হয়েছিল।……কি আশ্চর্য্য নীরবতা বাসার চারিদিকে আজ। সারাদিন হৈ চৈ চেঁচামেচি। আজ অদ্ভুত ভাল লাগছে বাড়ীটা। সব কিছুর 'পর যেন নিঃসঙ্গের প্রলেপ। বেশ নিস্তব্ধ শান্ত হয়ে পড়েছে সব। কোথাও উত্তেজনা নেই। হারাণীর মনের উত্তেজনা ঝিমিয়ে পড়ে। যদিও মনে মনে রাগ যে করেছিল তা স্বীকার করতে ও চায় না। মন পরীক্ষা……আর কিছু নয়। ভারী ভাল লাগচে হারাণীর। অনেকদিন এমন চুপচাপ থাকেনি হারাণী। হঠাৎ হারাণী ভাবতে থাকে, এখন আর ওর সংসারে না করলেও চলে। তিন ছেলের মাঝে বড় দু' ছেলের বিয়ে হয়েচে, ছোটটি দেশের কাজ করবে, স্বদেশী,—বিয়ে

করবে না। সবাই সাবালক। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়ে গেচে। এখন তো হারাণী নানা জায়গা ঘুরতে পারে। পারে কাশী গিয়ে কিছুদিন ঘুরে আসতে। কি বাকী জীবনটা সেখানে কাটিয়ে দিলেই বা কি। উনির বাবস্থা বৌমারা করবে, মেয়েরা করবে; হারাণী যদি মরে যেত তো উনির কি কোন সেবা যত্ন হোত না। মানুষের অভাবে কি আটকায়। না, এবার চোখমুখ বুজে যাত্রা করবেই। জোর করে বেরিয়ে না পড়লে আর যাওয়াই হয় না। দেখে আসুক না বাইরের জগতটা কিছু দিন। কামনা নিয়ে মরাও পাপ। সেই পাপের জন্যে আবার জন্মাতে হবে। আবার এতো ভুগোন। সংসারে কর্ত্তব্য তো এতকাল করেচেই। নিজের দিকে তাকায় নি। এবার যাক না,—কষ্ট হলে অবশ্য ঐ বুড়োরই হবে। আর কারো কিছু হবে না। তা হারাণী আর কি করবে? এতকাল তো করেচেই। এবার বৌমারা ভাল করে সেবাযত্ন করুক। চপ্ কাটলেট খাওয়াক। কিন্তু হারাণীকে আর কেন? কিছুদিন নিরিবিলিতে কাটিয়ে আসুক। শ্বশুরের কালে পারেনি, স্বামীর কালেও হয়নি, এখন ছেলের সময়, এখন আবার কি? এখন তো স্বাধীন।

……সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠল। কিন্তু কেমন ক্লান্তি ক্লান্তি মনে হচ্ছে নিজেকে। থাবার চিন্তাতেও কেমন উৎসাহ পেল না। সেজন্যে কাউকে কিছু বল্লও না। কেমন যেন অবসাদ। গা কিছু গরম হয়েচে। জিভ তেতো মনে হচ্ছে। কিছুই ভাল লাগচে না। সবই বিস্বাদ, কোন কিছুতেই উত্তেজনা নেই। বিছানা থেকে উঠল না। কি হবে আর উঠে। ওরা নিজেদের সংসার নিজেরা গুছিয়ে নিক।

ছেলে ডাক্তার আনতে চাইল, বৌরা হাত মাথা টিপতে লেগে গেল, নাতীনাতনীরা ঘরের মাঝে হৈচৈ করতে লাগল, দেবর হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিল, ছেলে ও জামাই নার্সী বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে এ নিয়ে তর্ক আরম্ভ করল, স্বামী শুধুমাত্র এসে বল্ল, কাল ঠাণ্ডায় বাগানে বেড়ান……বুঝলে না… ওতেই……শরীর তো ভাল যাচ্ছে না।"

তিনদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ভুগে উঠে হারাণী মনে মনে স্থির করল, এবার কিছুদিন এ বাড়ী ছাড়া হবেই। সারাটা জীবন তো ঐ সাত আটখানা ঘরের মাঝে কেটে গেল। আর নয়।…… জীবনে বহু কষ্টের সময় মাঝে মাঝে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে আত্মহত্যা করবার কথা ভাবচে, কিন্তু আত্মহত্যা করলে প্রেতাত্মার মুক্তি হবে না, এ বাড়ীতেই চিরকাল থাকতে হবে, তখনই ঐ ভাবনা থেকে নিবৃত্তি হয়েচে। তা হলে তো মরেও মুক্তি নেই।…আজ ভাবে, আর নয়, এবার রওনা দেবে। কথা ঠিক হয়ে গেল। ওর এক ভাগনে ওকে নিয়ে যেতে এল। আপাততঃ কাশী যাবে। সেখানে মাসখানেক থাকবে। তারপর রামেশ্বর পর্য্যন্ত দেখবে সব, কামনা পুরণ করে যাবে। মরলে যেন সত্যি সত্যি মুক্তি হয় ওর। এ বাড়ীতে যেন থাকতে না হয়। বাকি জীবনটা ভাল করেই কাটুক।

কাশী এসেছে দিন পাঁচেক হলো। নির্জ্জনতার স্বাদ, একা থাকবার ইচ্ছা ওর দুদিনেই চলে গেচে। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে ওর ছোট ছেলেকে ভোরবেলা বেশী দুধ ও দেয়নি? এমনিতেই

বড্ড উদাসীন। মেয়ে তো সারাদিন স্বামী নিয়েই ব্যস্ত। অথচ ওর সময়ে এমন ছিল না। শ্বশুর বাড়ী থেকে নিতে এলে ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে থাকত। বলত, "দাদা, না করে দাও বলে দাও আজ শরীর খারাপ, কিংবা যা হয় কিছু বানিয়ে বলে দাও…। কিন্তু আজকালকার মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী থেকে আসতে চায় না।……হঠাৎ দুপুরবেলা হারাণীর মনে হয়, উনিকে বোধ হয়, খেতে দিতে দেরী করছে। তবু মুখ ফুটে উনি কিছু বলেন না। যত নবাবী স্ত্রীর 'পর। এমনিতে লোকটা ভয়ানক লাজুক। বড় বৌমা বড্ড ঢিলে। ছোট বৌমা তো বাপের বাড়ী। বিয়ের পর প্রথম শ্রাবণ মাসে বাপের বাড়ী থাকবে। উনির নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। ছোটনাতির সামনে না বসে থাকলে কম থাবেই। এখনও নিজের পেটের ওজন বুঝে না। ছেলে পালন করা বড় কঠিন। একটি ছেলে পালন করতে হলে দুটো সংসার ডুবোতে হয়। আবার হারাণীর মনে হয়, সারা ভোর উনি বোধ হয় একা। বুড়োর কাছে কেউ বসে না। মন উতলা হয়ে উঠে। প্রথম প্রথম, হারাণী নিজেকে বুঝল, ওমন সকলেরই বাড়ীর জন্যে মন কামড়ায়। এসব মায়া দুদিন পরেই চলে যাবে।

—…আসবার সময় স্বামী বলেছিল, "তোমার বাড়ীঘর……তোমার তৈরী সংসার যা বোঝ কর।"

……কিছুদিন পর স্বামীর কাতর মুখ স্বপ্নে দেখে অস্থির হয়ে উঠল। সংসার ছাড়া যাবেনা। স্রষ্টা চেষ্টা করলেও নিজেকে সৃষ্টির বাইরে নিতে পারেন না। সৃষ্টির সবটুকুই স্রষ্টার। হারাণী বাড়ী ফেরবার আয়োজন করে।

মোটর যখন বাড়ীর কাছে উপস্থিত হতে লাগল। তখন হারাণী ভাবতে থাকে, "এ আমার তৈরী সংসার, এখানেই আমাকে চিরকাল থাকতে হবে। এই আমার কাশী এই আমার রামেশ্বর। শ্বশুর ছিলেন, স্বামী আছেন, ছেলেরা আছে, নাতী নাতনী সবাই আছে—আমি যাব কোথায়?

বাড়ীতে পা দেবামাত্রই বড় ছেলে বল্ল, "মা তুমি এসেছ, বাঁচা গেছে। কাল থেকে বাবার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। আজ ভোরেই তোমাকে টেলিগ্রাফ করেছি……।"

আজকাল থাবার দিতে বৌমারা বড্ড বেশী দেরী করে—হারাণী মনে মনে ভাবে। বৌদের কি ক্ষিধে পায় না? আজ বছর পাঁচেক হল এ অবস্থা হয়েচে। কোন কিছুরই নিয়ম নেই। কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সংসারে আর লক্ষী নেই। সব কেমন ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। হারাণী আর কি করবে? ওর কিছু করবার নেই। হারাণী ভাল করে চলতে পারে না, চোখে দেখে না—বাঁ চোখে ছানি পড়চে। শরীরের চামড়া ঝুলে গেছে। কোমর বেঁকে গেছে অবশ্য বহুদিন হোল। হারাণী সেদিন ভাবতে চেষ্টা করেছিল, ওর বয়েস। তা প্রায় পঁচাশীর মত হবে বৈকি। স্বামীও মরেচে প্রায় বছর বিশ পঁচিশ। ছোট ছেলে মরল প্রায় বছর পনর আগে, জেলে।

শ্বশুড়ের মুখ আর মনে আসে না। সেদিন অনেকক্ষণ স্বামীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করল। অনেক কষ্টে ওর মনে ওদের বাপের বাড়ীর এক পুরুতের মুখ মনে এল। আর কিছুই না।……আবার একদিন সারা ভোর স্বামীর চেহারা ওর চোখে ভেসেছে। কেমন যেন মিলিয়ে যায়, গুলিয়ে যায়। হঠাৎ স্বামী কেমন যেন ছোট ছেলের মত হয়ে গেল—। কি জানি সব হয়। স্বামীই হঠাৎ বাবার বেশে হাজির। স্বামীর চেহারা অবিকল বাবার মত হয়ে গেচে। তথাপি কেমন যেন স্বামী স্বামী মনে হয়। শাশুড়ীর সঙ্গে ওদের বহুকাল মৃত একটি স্ত্রির কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।……আজকাল ওর প্রায় কিছু মনে থাকে না। খেয়েচে কিনা মনে থাকে না। খাবার আধ ঘণ্টা পরেই হয়ত ভুলে যায় যে খেয়েচে। মাঝে মাঝে বড় ছেলেকে ডাকতে চায়। হয়ত ডাকতে ভুলে যায়। একই সঙ্গে ওর মনে বহু চিন্তা চলতে থাকে। একজন ছেলেকে ডাকতে চায়, একজন খাবার কথা চিন্তা করে, একজন স্বামীকে ভাবে। এজন্যে হয়ত ছেলেকে ডাকব ভাবা সত্ত্বেও ডাকা হয় না। রেগে উঠে। বকতে ভুলে যায়। রাগ যে করেছিল তাও ভুলে যায়। ছেলেকে ডাকছিল তাও। হঠাৎ হঠাৎ কাঁদে, কেন কাঁদে জানে না। অনেক সময় যে কেঁদেচে, সে খবরও নিজেই রাখে না। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে টেরও পায় না।

নাতনী বলছিল, "আজকাল ঠাকুরমার তনাবহাল নেই। দেখিস না, বিছানা ভিজে থাকে, …আজকাল প্রায়ই ওমন হয়।"

হারাণী ভাবে, ছেলেমেয়েরা কেউ বড় কাছেও আসে না। একটু বসে গল্পও তো করতে পারে। একা একা কতক্ষণ থাকা যায়। কেউ আসে না। সবাই ওকে ভুলে যায়।……এত এত দেরীতে রান্না হয় কেন? দেরীতে খেয়ে সবাইর পিত্তি পড়ে অসুখ হবে। ছোট ছেলেটা সকালে মরে গেল। স্বামী মাঝের থেকে কষ্ট পেল না। পুণ্যের শরীর। আজকাল ক্ষিদেটা বড্ড বেশী।……আফিম খায়। দুধ বড় কম দেয়। দাম বেড়েচে। কেন ওদের গ্রামের শের সাহেবের বাজার থেকে দুধ আনলেই চুকে যায়। কিংবা নিমাই গোয়ালাকে বললেই তো রোজ করতে পারে। নিমাই ওর বিয়ের সময় দুধ দিয়েছিল। খাঁটি লোক।……হঠাৎ হারাণীর মনে হয়, ওর মাথায় কাপড় নেই দেখে হয়ত শাশুড়ী বকবে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে মাথার কাপড় তুলে দেয়।……আবার ভাবতে থাকে, বাড়ীতে সর্ব্বদাই কি যেন সর গণ্ডগোল হয়……ঝগড়া করে, দিনেরেতে ঝগড়া করে…… বাড়ীতে অলক্ষ্মী ঢুকেচে।……সন্ধ্যায় জলের ছিটে দেয় না, বাড়ীতে অলক্ষ্মী এসেচে—অন্ধকার বারান্দায় বসে ভাবে হারাণী। হারাণী ভাবে, বড় নাতীর ছেলের বৌটি বেশ ছেলেমানুষ। বুড়ো বলে হারাণীর কাছে মাঝে মাঝে এসে বসে। এই তো জ্বর হয়েছিল—তা নাতীর বৌটি ছাড়া কেউ আসেও নি।……বড় ছেলের হাঁপানী……বাপের ধারা……ঠাকুরদারও ছিল। ঠাকুরদা বলেছিল, গনার বৌর ওমন পুরুষালী চলন ভাল নয়। এখন বলে আর লাভ কি, হারাণী তো চলতেই পারে না। এখনও বলবে? এখন আর বলতে পারবে না।

……সেদিন হঠাৎ হারাণীর ছেলেরা হারাণীর কাছে এল।

"মা, শুনচ, বাড়ীটা বিক্রী, হ্যাঁ বিক্রী করে দিলুম"—বল্ল বড় ছেলে। মেঝ ছেলে বল্ল, "তুমি এখন কাশীতে গিয়ে থাকবে। দাদা তোমাকে দশ টাকা করে, আর আমি দশ টাকা করে মাসে মাসে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। ওখানে আমার পিসিশাশুড়ী আছেন, একসঙ্গে থাকবে…… ঠাকুর চাকর আছে……অসুবিধা হবে না।"

হারাণী বুঝতে চেষ্টা করে, "বাড়ী বিক্রী করে দিলি?"

"না দিলে তো চলে না মা. অনেক ব্যাপার।" বল্ল বড় ছেলে।

"আমি যাব কোথায়"—হারাণী অবিশ্বাস্য মুখে জিজ্ঞেস করে।

"কাশীতে"—বল্ল মেঝ ছেলে।

হারাণী আর শুনতে চাইল না। কাশীতে কি করে যাবে হারাণী? যাবে না। এখানে শ্বশুর রয়েচে, বলেচে বৌর চলনটা বড্ড পুরুষালী। এখন আর কেমন করে বলবে? এখন তো হারাণী ভাল করে চলতেই পারে না। শাশুড়ী বলত: বৌর লজ্জা-সরম কম। লজ্জা-সরম কি করে থাকে? ওর আলোয়ানটা ভিজে গেচে। না শুকোলে কি ভিজে জিনিষ গায়ে দেবে। শাশুড়ী বলেই থালাস। এবার নাতীর ছেলের বৌকে বলবে। বেশ ভাল লোক, ছেলেমানুষ। বুড়িকে আদর যত্ন করে। শ্বশুরের বাড়ী, ওরা কেন বিক্রী করবে? ওদের বিক্রী করতে লজ্জা করে না, কত কষ্ট করে শ্বশুর এই বাড়ী করেচে……দেখেচে হারাণী। শ্বশুর বলেচে, 'গনা লক্ষ্মীছাড়া, তুমি সব রক্ষা কর।' তবে? এখন কেমন? কোন মুখে বিক্রী করবে শুনি। বিক্রী? যেন মুখের কথা। স্বামী বলেচে, 'তোমার বাড়ী তোমার ঘর, তুমি যাবে কোথায়।' ছেলে মরেচে এখানে… । হারাণী কি করে যাবে…।

……বড় নাতী বল্ল, "ঠাকুরমা, তুই কালই কাশী যাবি……সব ঠিক করে নে……কাশী যাবি, কাশী হ্যাঁ, কাশী।"

একটু জোরে না বললে শুনতে কষ্ট হয় ওর। আজকাল সকলেরই গলার স্বর কেমন যেন ক্ষীণ হয়ে গেচে… ।…গলার জোর নেই……ভাত খায় না।

কাশী যেতে হবে কালই—শুনতে পায় হারাণী! সে কি হয়? যাবে কি করে? ঝিমতে থাকে হারাণী। কাশী থেকে ফেরত এল কি কাশী যাবার জন্যে? দিনরাত বাজে কথা বলবে, আবোল তাবোল বকবে। অলক্ষ্মী ঢুকেচে বাড়ীতে। সন্ধ্যায় ধূপ ধুনা দেয় না। এ বাড়ী ছেড়ে যেতেই পারে না।

স্বামী বলেচে, "এ বাড়ীর লক্ষ্মী।" থাকতেই হবে। কি আর করবে, প্রেতাত্মা হয়েই থাকবে।

সমস্ত আফিম হাতে নিয়ে পাকাতে থাকে হারাণী। আজকাল খেতে দিতে বড্ড দেরী করে বৌরা। ওদের কি ক্ষিদে পায় না। এত ক্ষিদে লাগে……কি আর করবে, থাকতেই হবে। হারাণী সমস্তটা আফিম গলায় ঢেলে দেয়।

"তোমার বাড়ী, তোমার ঘর তুমি যাবে কোথায়"—স্বামী বলেচে। শ্বশুর বলত, "বৌর অমন চলন কেন ?.....গনা ছন্নছাড়া। তুমি আছো, তাই নিশ্চিন্তে মরব।"

স্বামী বলত, "দেখ না চেয়ে, ভাল লোকের খেলে কিছু হয় না।...কিছু নয়, ওষুধ।"

বাবা বলত, "প্রিয়ংবদা।"

হারাণী দাঁড়াতে চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে সব অন্ধকার হয়ে আসে।.....স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, সবাই মরেচে, সবাই চলে গেচে।.....ওরাও চলে যাবে ? বাড়ীতে থাকবে কে ?.....

হারাণী টান হয়ে শুয়ে পড়ে। আর ওকে কেউ কাশী পাঠাতে পারবে না। হারাণী ভিতরে থেকে গেল।

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাদ্ধশান্তি শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন সুরু হতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। দীননাথ এতক্ষণ নীরবে সমস্ত কিছুই দেখছিলেন ঘুরে ঘুরে। মাঝে মাঝে ভাস্করকে বিপিনকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন চুচারটে কথা বলে। এবার তিনি আস্তে আস্তে তাঁর শ্বশুরমশায়ের ঘরে এলেন। দেখলেন, বৃদ্ধ মুদিতনয়নে স্থির হয়ে বসে আছেন বিছানায়। কিছু বলতে কেমন যেন বাধল, তাই উপস্থিতিটা জানালেন একটু কেশে।

বৃদ্ধ চোখ মেলে দেখলেন দীননাথকে, তারপর বললেন, ওদিকের কাজ শেষ হল।

দীননাথ ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

বৃদ্ধ কিছু বললেন না। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষ তাঁর শ্বশুর মশাইকে কিন্তু এত স্থির দীননাথ নতুন দেখলেন।

—কিছু বলবে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে আজই যেতে হবে। ছুটি না নিয়েই চলে এসেছি।

—বেশ ত, যেও। দ্বিজকে কিছু বলেছ কি ?

—আজ্ঞে না।

—ওকে একটু বলে যেও। আমি ত কিছু বলতেই পারছি না মাকে। বৃদ্ধের গলাটা ধরে আসে।

দীননাথ চুপ করে থাকলেন এবার, কিছু বললেন না।

—তোমার ট্রেন কটায় ?

—সাতটা নাগাদ।

দীননাথ আরো কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন।

—কিছু মুখে দিয়েছ ?

—আজ্ঞে না, এবার যা হক—

—কেই বা করবে, কেই বা দেখবে। বৃদ্ধ একটু থামলেন, তারপর বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস না। আমি আসছি। কথা শেষে বৃদ্ধ খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

স্টেশনে যাবার আগে দ্বিজবালার সঙ্গে দীননাথের দেখা হল। কি যে বলবেন ভেবে পেলেন

না। দুজনে নিশ্চুপ—ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। দ্বিজবালার মুখখানা বড্ড করুণ—এত করুণ মুখ দীননাথ দেখেন নি দ্বিজবালার। কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না, তাই কিছু বলতে পারছেন না দীননাথ। এ জগতে কিছুই ত একভাবে থাকে না—সবেরই একটা সুরু, আর একটা শেষ আছে। কিন্তু সত্য জেনেও মানুষ ধরে রাখতে চায়, ছাড়তে পারে কই?

দীননাথ বললেন, আমি যাচ্ছি, ওরা সব রইল।

দ্বিজবালা কিছু বললেন না। শুধু ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে চাইলেন দীননাথের দিকে। সেই হারানো দৃষ্টির কাছে দীননাথের কথাও হারিয়ে যায়। শুধু তাঁর হাতের স্পর্শটাই সান্ত্বনার শেষ কথাটুকু ব্যক্ত করে। ঐ স্পর্শ দ্বিজবালাকে উন্মুখ করল, বেদনার ঘন মেঘ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, কাঁদলেন দ্বিজবালা অনেকক্ষণ ধরে দীননাথের কোলে মাথা রেখে। আর দীননাথ আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন দ্বিজবালার মাথায়।

বাবাকে খুঁজতে এসে থমকে দাঁড়াল সত্যজিৎ দরজায়। মা কাঁদছে বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে—এ দৃশ্য সত্যজিৎ কোনদিন দেখেনি। অবাক হল, ভাল লাগল, আর একটা সঙ্কোচ এল, তাই ও সরে এল দরজার কাছ থেকে।

বাবার সঙ্গে সেও চলে যাবে। ঐ সরমাকে ঠিক সহ্য হচ্ছে না তার। বড্ড দেমাকী। ওই যেন এবাড়ীর সব। এখানে তাই আর একটুও থাকতে ইচ্ছে নেই। বাবা যাবে শুনে সেও যাবে একথা বলতে এসেছিল ও, কিন্তু এখন ওঘরে যেতে কেমন যেন লজ্জা করছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল সত্যজিৎ।

চৌদ্দ

মুখুজ্জেদের বাড়ীতে স্মরজিতের কর্তামিতে শান্তি অতিষ্ঠ। বড্ড বাজে কথা বলে স্মরজিৎ, এত বিরক্ত করে। তারপর ফরমাস। বৈঠকখানায় ওদের ক্লাবটা উঠে এসেছে। যা চেংড় ওর বন্ধুবান্ধব। সিগারেট আর চা। ভুবনমোহিনী ত রেগে আগুন হয়ে উঠেছেন স্মরজিতের ওপর। দুপুরে গলা ফাটিয়ে বৈঠকখানায় স্মরজিৎ যখন গান ধরল, তখন ভুবনমোহিনী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তেড়ে গেলেন, সাপের পাঁচ পা দেখেছিস হতভাগা? বাপ খুড়ো নেই বলে যা খুসি তাই করছিস যে! বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হৈ হৈ করগে। কান ঝালাপালা করে দিলে। আর তোমরাই বা কিরকম ছেলে বলতো, বাড়ী ঘর নেই তোমাদের—যাও বাড়ী যাওগে।

অনেকগুলো ছেলে ছিল বসে। তারা মুখ নীচু করে রইল।

—তুমি যাওনা ঠাকুমা। গোলমাল এমন কিছু হয়নি।

—হয়নি। তাহলে আরো হবে?

—বলছি তো হবে না। কেন বাজে বকছ, যাও এখান থেকে। স্মরজিৎ বিরক্ত হয়ে বলে উঠল।

—ধমকানি দিচ্ছিস আমাকে হতভাগা? দাঁড়া তোর কাকা আসুক ফিরে একবার। ভুবনমোহিনী ফিরে গেলেন আর কিছু না বলে। স্মরজিৎ তাঁকে ধমক দিয়ে কথা বলে! এতদূর বেড়েছে হতভাগা। শান্তির কাছে দুঃখ করলেন ভুবনমোহিনী। শান্তি কি বলবে, তারও বিরক্তির শেষ নেই।

নাম-গান কিন্তু সন্ধ্যার পর ঠিকই হচ্ছে। শ্যামভাই, গোপীনাথ, বলাইচাঁদ সন্ধ্যার পর আসর জমান। দীননাথ বিপিনের অনুপস্থিতিতে কিছু এসে যায়নি। প্রতিদিনের মতই ভুবনমোহিনী ও শান্তি ঠাকুরঘরে বসে নাম-গান শোনেন। ভুবনমোহিনী কীর্তন শেষে প্রসাদ বিলোনোর সময় থালি একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, স্মরজিৎ হয়েছে কর্তা, একটা জিনিষ বললে আর একটা জিনিষ আনবে, কি যে করি। এই দেখনা, আজ একগাদা মজা কলা এনেছে। কলাগুলো পাতাতে সাজাতে সাজাতে বললেন ভুবনমোহিনী।

—ঠাকুরের হয়ত মজা কলাই খেতে ইচ্ছে হয়েছে খুড়িমা। হেসে বলেন শ্যামভাই।

—তা আর না হয়ে উপায় কি বল, যা চণ্ডালের হাতে পড়েছে। ঠাকুরের ভাগ্যি যে তাও পেয়েছে।

স্মরজিৎ কিন্তু দিব্যি আছে। সন্ধ্যে হলেই ফর্সা জামাকাপড় পরে বেরিয়ে যায়। আসে রাত এগারোটার আগে নয়। আড্ডাখানায় তাস, ক্যারম খেলা, আর নয়ত সিনেমায় যাওয়া। পয়সা মন্দ থাকেনা হাতে। বাজারের পয়সা থেকে বেশ কিছু তো থাকেই। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আড্ডাখানার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই বলে। বিশেষ করে, ঠাকুমার কাছ থেকে বকুনি খাবার পর স্মরজিৎ বন্ধুবান্ধব সবাইকে বললে, দেখ্‌না মাইরি একটা ঘরটর। সকলে মিলে চাঁদা তুলে না হয় ভাড়া দেওয়া যাবে। এমনি করে কি আড্ডা জমে?

—বিশেকে বল না, ওর বাবাকে বলে ওদের বাইরের ঘরটা দিতে।

—যা মাইরি! সে কি হয়, তাহলে আমি আড্ডা মারব কি করে?

—যা যা আর ন্যাকামি করিসনি। শালার দাড়িতে কড়া পড়ে গেল, বিয়ে করলে তিনটে ছেলের বাপ হতিস, এখনো বাবার ভয়! কেষ্টচরণ বলে উঠল।

—অত ঝামেলার কি দরকার বাগু! বটুকবাবুর বাড়ীতে একটা ঘরভাড়া টাঙানো রয়েছে, খোঁজ কর না। মোটা শিবু বললে।

—কথা মন্দ বলিসনি তুই, কিন্তু ওখানে শুনেছি দু-একটা হাফ গেরস্ত থাকে।

—ওরে আমার সোনার চাঁদ রে! কেন, চরিত্তির খারাপ হবে নাকি?

—তা নয়, পাড়ার মধ্যে কথা উঠতে কতক্ষণ?

—তা উঠুগ গে। চ শিবু, ঘরটার খবর নিইগে। সন্ধ্যার মুখে স্মরজিৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে। সরকারদের রোয়াকে বসে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল, দু-একজন ছাড়া।

এ পাড়ার ছেলেদের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তির লক্ষণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আগের দিনের

একবয়সী কিংবা দু-তিন বছরের ছোট বড় সকলে যে একসঙ্গে মেলামেশা করত, তা কমে যাচ্ছে—বলাইচাঁদ দুঃখ করে বলে—আমাদের ছোটবেলায় সবাই একসঙ্গে খেলেছি, মারামারি করেছি, একসঙ্গে গুঁতাবসা করেছি, কিন্তু আজ—

আজ পাড়ার ছেলে ছিটকে যাচ্ছে বেপাড়ায় বন্ধুত্বের আশায়। পাড়ায় যারা আছে তাদের বিভিন্ন মনোবৃত্তির ফলে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন আড্ডা। নতুন লোকও আসছে এ পাড়ায়। বেশ কয়েকঘর নতুন ভাড়াটে এসেছে। পাড়ার পুরোনো ধারা আজ যেন সত্যই ব্যহত। এক নজর দেখলেই ভেজালটা ঠিক চোখে পড়বে। এটা কি ভাল লক্ষণ? বলাইচাঁদ প্রশ্ন করে গোপীনাথকে।

—ভালমন্দ কি করে বলব, তবে আমাদের ভাল লাগছে না। গোপীনাথ উত্তর দেয়।

—মুখুজ্যে বাড়ী মিত্তির বাড়ীর ছেলেগুলোও যেন কেমন আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু বড় চোখে লাগে। অমন বাপ কাকা যাদের তারাও যে যার খুশী মত ছিটকে যাচ্ছে। এটা সত্যি দুঃখের কথা।

—যুগের হাওয়া এমন করেছে।

—যুগের হাওয়া? কি জানি ভাই ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এটা ভাল লক্ষণ নয়। তুই দেখিস ফলটা খুব খারাপ হবে। বলাইচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

সত্যিই যুগের হাওয়া মুখুজ্যে বাড়ীর পুরোনো বৈষ্ণবী আবহাওয়াকে দূষিত করছে। এটা কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হল যখন বিপিনও কীর্তনের আসরে অনুপস্থিত হতে লাগলেন। কেষ্টনগর থেকে ছিজবালা আর চন্দ্রা ছাড়া আর সবাই ফিরে এসেছে। সত্যজিৎ দীননাথের সঙ্গে আগেই চলে এসেছিল। বিপিনও চলে আসে তার পরদিন। কিন্তু এসে পর্য্যন্ত ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে এত ব্যস্ত বিপিন যে রাত দশটার আগে বাড়ী ফিরতে পারে না।

স্বরজিৎ কোনদিনই হরিনামের আসরে আসেনি। সত্যজিৎও আজকাল আসে না। খালি দীননাথ শ্যামভাই নিত্য বসেন, সঙ্গে বলাইচাঁদ আর গোপীনাথ। শ্যামভাই ইতিমধ্যে একদিন সত্যজিৎকে ডেকে হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাই সত্যানন্দ, তুমি কি আমাদের ভুলে গেলে?

—কই, ভুলে যাইনি তো! হেসে বলে সত্যজিৎ।

—ভুলে গেছ বৈকি। তা নইলে আসরে আসো না কেন?

সত্যজিৎ চুপ করে থাকে একটু, তারপর ম্লান হেসে বলে, ভাল লাগেনা, তাই আর যাই না।

—ভাল লাগে না! তাহলে ভাই তোমাকে জোর করব না। যা ভাল লাগে তাই কর তুমি। শ্যামভাই হেসে বলেছিলেন শুধু।

তারপর আর কেউ সত্যজিৎকে বলেনি কীর্তনের আসরে যেতে। দীননাথ তো বলবেনই না। তিনি কাউকেই কিছু বলে করাতে রাজি নন। যার ইচ্ছে হয় সে আসবে, ইচ্ছে না হয় আসবে না। জোর করে কিছু করানোর মধ্যে তিনি নেই। ভুবনমোহিনী দু-একবার যে বলেননি তা নয়, কিন্তু সত্যজিৎ তাঁর কথাও শোনেনি।

—যা খুসি করগে। ভাল কথা তো কানে নিবিনে। ঘোর কলিযুগ। ভাল জিনিষের মূল্যই নেই। ভুবনমোহিনী দুঃখ করে বলেন।

আর একজন কিছু না বলেও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সত্যজিতের চালচলন। সে হল শান্তি। সামান্য এক টুকরো ঘটনা। দুটো মেজাজের একটুখানি গরমিল, দুটো কথা কাটাকাটিতে মনের এমন জায়গায় চিড় খেল যে আর সংজ্ঞে মুখোমুখি হয়ে আগের সুরে ফিরে এল না। ভাল কেটে গেছে। লয়ের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শান্তি আর সত্যজিৎ পরস্পরের প্রতি নির্বাক। কিন্তু তা বলে শান্তি উদাসীন থাকতে পারে কই। সম্পূর্ণ সজাগ সে সত্যজিতের প্রতি। আর সেই কারণেই সত্যজিতের পরিবর্তন ওকে পীড়া দেয়।

এর মধ্যে চরণকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করলে শান্তি, হ্যাঁরে বিটলে, সত্যজিৎ এত দেরী করে ফেরে কেন রে?

—দেরী করে ফেরে নাকি?

—জানিসনে বুঝি?

—জানিনা বাপু ওসব ভাল ছেলেদের খবর।

—খুব হয়েছে। নিজের বন্ধুর খবরও রাখিস না আবার বড় বড় কথা বলিস। শান্তি সঠিক উত্তর না পেয়ে চরণের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

—বন্ধু! কে, আমি! ওর মত ভাল ছেলের বন্ধু হবার ভাগ্য করেছি কিনা। শান্তিকে রাগাবার জন্যে হেসে বললে চরণদাস।

—থাক, কথার ফুলঝুরিতে আর কাজ নেই। যা ডেপো ইস্কিস দিন দিন। বিরক্তি আসে শান্তির। ও আর দাঁড়ায় না।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

সাহিত্য-সমালোচনা

আজকাল 'সমালোচনা-সাহিত্য' বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। হয়তো এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে উপযুক্ত সমালোচকের হাতে পড়লে সমালোচনা নিজেই সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। কথাটা সত্যি সন্দেহ নেই। পশ্চিমী সাহিত্যে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনাগুলি সত্যিই 'সমালোচনা-সাহিত্য' আখ্যা পাবার উপযুক্ত।

সমালোচনা-সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ সাহিত্য-সমালোচনার সাহিত্যকেই বোঝায়। এই সাহিত্য-সমালোচনা কথাটা কিন্তু এত সরল নয়। এ কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাহিত্য ও জীবনের নানা মৌলিক প্রশ্ন। সাহিত্য-সমালোচনার স্থান কোথায়, সাহিত্য-সমালোচনার কষ্টিপাথরই বা কী—ইত্যাদি বহু প্রশ্ন। এ প্রশ্নগুলির সর্বজনগ্রাহ্য কোন উত্তর আছে কী না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য হোক বা না হোক কোন একটা উত্তর না পেলে সাহিত্য সমালোচনায় এগোনো কঠিন।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে যে সাহিত্যে সমালোচনার প্রয়োজন কী? সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, পাঠক তার রসাস্বাদনে তৃপ্ত হলেন, এরমধ্যে 'সমালোচকের' সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সমালোচনার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। সাহিত্যে সমালোচনার কাজ হলো ত্রিবিধ—প্রথমতঃ সাহিত্যের স্বরূপ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর উদ্ভাবন। অবশ্য এই উত্তরগুলি ব্যক্তি-মানস ভেদে ভিন্নরূপ ধারণা করবে। কিন্তু এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তরগুলি স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েই বিভিন্ন সমালোচক সমালোচনায় এগোন। সমালোচনার কষ্টিপাথরও এই উত্তরগুলিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, পাঠকের সঙ্গে একযোগে সাহিত্যের রসাস্বাদন। সমালোচনার এটিও একটি প্রধান শাখা। সাহিত্য রচনার মূলমন্ত্র হলো কোন একজনের ভাবনা বেদনা অনুভূতিগুলি সকলের করে তোলা। যখন লেখক-চিত্ত ও পাঠক-চিত্তের সম্পূর্ণ মিলন ঘটে তখনই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে ও তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলা চলে। কিন্তু এই মিলন সর্বত্র স্বতঃসিদ্ধভাবে হয়না। বহুক্ষেত্রেই লেখক-চিত্ত সাধারণ পাঠকচিত্তের বোধশক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়,—বিশেষ করে চিন্তার জটিলতায় ও অনুভূতির সূক্ষ্মতায়। তদুপরি লেখকচিত্ত ঠিক খণ্ডে আবদ্ধ থাকেনা—একটা সামগ্রিক বোধে পরিণত হয়। সেই সামগ্রিক বোধ সাধারণ পাঠকের কাছে সব সময় সহজবোধ্য হয় না। আবার লেখক অনেক সময় নানা চিত্র ও প্রতীকের সাহায্যে মনোভাব বিবৃত করে থাকেন—যা সাধারণ পাঠকের কাছে হেঁয়ালী হয়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে সমালোচকই লেখক-চিত্ত ও পাঠক-চিত্তের সেতু স্বরূপ। বিশেষ

অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চিন্তার দ্বারা সমালোচক লেখক-চিত্তের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেন এবং সেই সাহিত্যের রস আস্বাদন করেন। তারপর সমালোচনার মারফৎ সেই রস পৌঁছে দেন পাঠকচিত্তে। এ জাতীয় সমালোচনায় মূলের সৌন্দর্য আরো বিকশিত হয় এবং পাঠকেরাও সমালোচকের সঙ্গে সাহিত্য রসাস্বাদনের আনন্দ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচনাই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে'ই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে এ জাতীয় সমালোচনা প্রকৃত রসজ্ঞ ছাড়া সম্ভব হয় না এবং প্রকৃত রসজ্ঞের হাতে পড়লে এ জাতীয় সমালোচনা নিজেই সাহিত্য হয়ে ওঠে।

সাহিত্য-সমালোচনার সবচেয়ে পরিচিত অথচ সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশই হচ্ছে কোন বিশেষ রচনাকে 'ভালমন্দ' চিহ্নে চিহ্নিত করা। প্রচলিত অধিকাংশ সমালোচনাই এ শ্রেণীর অন্তর্গত। এক্ষেত্রে সমালোচক রসিকের আসন ছেড়ে বিচারকের আসনে গিয়ে বসেন। লেখকের রচনা প্রকৃত সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হল কি না তা দেখবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। হয়তো সাধারণ পাঠকেরাও এ শ্রেণীর সমালোচনাকে ভিত্তি করে পাঠ্য ও অপাঠ্যের তালিকা প্রস্তুত করেন। সেদিক দিয়েও এর উপকারিতা আছে। বস্তুতঃ আজকাল এত রচনা প্রকাশিত হচ্ছে যে একজন সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত পাঠকের স্বল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু পড়ে উঠতে পারা কঠিন। সেরূপ ক্ষেত্রে পাঠকের পক্ষে বাছাই করতেই হয়। সেই বাছাইএর জন্য এ ধরণের সমালোচনা অপরিহার্য।

কিন্তু এর উল্টো দিকটাও আছে। সমালোচকের রায়, বিশেষ করে তা যদি কোন প্রসিদ্ধ সমালোচকের হয়, সহজেই পাঠক-চিত্তকে বিভ্রান্ত করে। বিচারের রায় দিতে গিয়ে সমালোচক প্রায়ই নিজের রসগ্রহণের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না। কিন্তু কোন কোন পাঠকের রসগ্রহণের ক্ষমতা সমালোচকের চেয়ে বেশীও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমালোচকের রায় শুনে পাঠক নিজ ক্ষমতার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তদুপরি নতুনকে চেনবার শক্তি ও তার রসগ্রহণের ক্ষমতা অনেক সমালোচকেরই থাকেনা। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মানস পরিবর্তিত হয় না। ফলে নতুনকে স্বাগত জানাতে অনেক সমালোচকই অক্ষম হন। এবং সেই সমালোচনায় আস্থাবান পাঠকেরাও সেই নতুন সাহিত্যকে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হন। সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে এর প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া আরো একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠতে পারে। পাঠ্য বাছাই করা যতো প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন তা অপরের পছন্দ অনুযায়ী কেন হবে? চিরকালই যদি পাঠক পাঠ্য নির্বাচনে সমালোচকের সাহায্য নেন তবে কি পাঠকের স্বাধীন রুচি গঠন করা কঠিন হবে না? বস্তুতঃ, সমালোচনার প্রথম দুটি দিক যদি যথেষ্ট বিকশিত হয় তাহলে তৃতীয় দিকটির প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে। সাহিত্যের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে যদি পাঠকের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে এবং রসিক সমালোচকের সাহায্যে পাঠক যদি নিজের রসগ্রহণ সম্পূর্ণ করতে পারে—তবে কোন রচনা সাহিত্যের পর্যায়ে উঠলো তা ঠিক করা পাঠকের পক্ষে খুব কঠিন হবেনা। সময়ের স্বল্পতা ও রচনার আধিক্যের সমস্যাটা তখনও থাকবে অবশ্য। তবু পাঠকের রুচি গঠিত হয়ে গেলে তারা

আর সমালোচকের রায়কে অভ্রান্ত বলে মেনে নেবেনা। হয়তো তাতে যুগে যুগে নতুন লেখকের পক্ষে স্বীকৃতি পাওয়াও সহজ হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্য-সমালোচনার সবগুলি দিক সমান প্রয়োজনীয় না হলেও সাহিত্য-সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই আছে। সাহিত্যকে যদি criticism of life বলে ধারা যায় তবে বলতে হয় যে সাহিত্য-সমালোচনাও জীবনের অপরোক্ষ সমালোচনা। তখনই প্রশ্ন ওঠে যে জীবনের এই সমালোচনা কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য সমালোচনা কখনই একদেশদর্শী হওয়া উচিত নয়। এবং সাহিত্যের বিচারেও রসের বিচারই সর্বশেষ কথা। তবু একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কখনো কখনো দেখা দেয়। বিশেষ করে আজকের সাহিত্যে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার আশু নিবারণের জন্য সমালোচকেরই এগিয়ে আসা উচিত। আজকের পৃথিবীতে চারিদিকে ভাঙন ধরেছে,—সমাজব্যবস্থায়, আর্থিক বুনিয়াদে এবং মানবমনে। মুষ্টিমেয়র স্বাচ্ছন্দ্যের পাশে বড়ো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে বহুর অস্বাচ্ছন্দ্য। আবার স্বাচ্ছন্দ্যেও তৃপ্তি নেই। ভরা ভোগের মাঝেও প্রশ্ন উঠছে—"কেন বাঁচবো।" মানবমন একটা শূন্যের মধ্যে ঝুলছে। জীবনের ওপর আস্থা ও একটা সুস্থ সবল আশাবাদ আজ খুব কমই দেখা যায়। সাহিত্যেও এর প্রতিফলন দেখা দিয়েছে। তাই সর্বদেশের সাহিত্যের একই অবস্থা।—সেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতাশা। কিন্তু জীবনে এটাই তো শেষ কথা নয়। আজকের সমাজ যদি মানবচিত্তকে পরিপূর্ণ বিকশিত করতে না পারে তবে নতুন সমাজ গড়ে তুলতেই হবে। এতদিনকার এই পৃথিবী তো হতাশা আর অবিশ্বাসের ধোঁয়ায় মিলিয়ে যেতে পারেনা। কিন্তু নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপই হবে জীবনবিমুখ মানবমনকে জীবনে বিশ্বাসী করে তোলা। বস্তুতঃ সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি শুধু চিত্তবিনোদন না হয়, যদি চিত্তউন্নয়নও তার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় তবে সাহিত্যকে এই কাজে এগিয়ে আসতেই হবে। আর এই পদক্ষেপে প্রধান সহায় হবেন সমালোচক। বর্তমানেও এমন অনেক অখ্যাত লেখক আছেন যাঁদের রচনা রসের বিচারে উত্তীর্ণ না হতে পারলেও জীবনের প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। তাঁদের রচনার সেই গুণটুকু পাঠকের চোখে তুলে ধরতে হবে। তদুপরি সমালোচনা করতে গিয়েও সমালোচক লেখক-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার সুযোগ পাবেন।

সাহিত্য আর তার সমালোচনা এমনই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একটি যদি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয় তাহলে অপরটিতে তার প্রভাব পড়া অনিবার্য। আবার সমালোচনা যেখানে নিজেই সাহিত্য হয়ে ওঠে সেখানে জীবনবাদী সমালোচক প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। সাহিত্য-সমালোচকদের দায়িত্ব বড়ো বেশী। আর সাহিত্য-সমালোচনার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই সাহিত্যের এই নিরাবলম্বতা ঘোচানো দরকার। তাই আজকের সাহিত্য-সমালোচককে এই দায়িত্ব নিতেই হবে।

সুতপা দত্ত

"শেষের পরিচয়ের" পরিচয়

শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনকালে "শেষের পরিচয়" শেষ করে যেতে পারেননি এটা খুবই দুঃখের কথা। বর্তমান প্রবন্ধে আমি "শেষের পরিচয়" উপন্যাস হিসেবে কি রকম হয়েছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি, কারণ শরৎচন্দ্রের এই শেষ বইটি সম্বন্ধে বেশী আলোচনা হয়নি।

এই উপন্যাসের নায়িকা সবিতা কয়েকদিন বৈধভাবে স্বামীর সঙ্গে জীবনযাপন করে ক্ষণিকের মোহে দূরসম্পর্কের নন্দাই রমণীবাবুর সঙ্গে কুলত্যাগ করেন। তারপর একটি একটি করে দীর্ঘ বার বছর পরে সবিতার বৈধ সন্তান (সবিতার কোন অবৈধ সন্তান নেই) রেণুর বিবাহ উপলক্ষ্য করে এই উপন্যাসের যবনিকা ওঠান হয়েছে। উপন্যাসে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত সবিতার নিজের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে নেওয়া হয়েছে : যেমন তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেরকম কথাবার্তা, আচার ব্যবহারে সংযম। একদিকে তিনি যেমন সূক্ষ্ম আত্মাভিমানী সেরকম তিনি আশ্রিতদের প্রতিও দয়ালু ; আবার যদিও স্বামীর ঘরে বাস করেন না তবু স্বামী গরবে গরবিনী। সবিতার এসব গুণাবলী (অবশ্য এখনও বিয়ে না হওয়ার জন্যে শেষেরটি বাদে) তাঁর মেয়ে রেণু যেন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে।

সবিতার স্বামী ব্রজবাবু পরমবৈষ্ণব এবং সাধারণতঃ ধর্ম্ম ও সমাজভীরু লোকেরা অর্থাৎ তথাকথিত সাধু ব্যক্তিরা যেমন ব্রজবাবুও সেইরকমই উদারচেতা, প্রাণখোলা, বেহিসেবী এবং দুর্বলচিত্ত। সবিতার প্রথম উপপতি (যার সঙ্গে তিনি কুলত্যাগ করেছিলেন) রমণীবাবুকে আমরা চকিতের জন্য একটু দেখি। তিনি ক্রোধান্ধ রক্তমুখে সবিতাকে কটুকথা বলতে বলতে উপন্যাসের দিগচক্রবালে চিরঅন্ধকারে মিশে যান। আমরা আর তাঁকে দেখতে পাই না। তাঁর ও সবিতার শেষ কটা দিন যে কি অপরিসীম গ্লানি ও ক্ষোভের মধ্য দিয়ে কেটেছিল তা বইতে খুব নিপুণভাবে বলা হয়েছে। শক্তিমান লেখকের হাতে পড়ে দৃশ্যটি অতি গভীরভাবে আমাদের মনে দাগ কেটে যায়, রেশ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে।

মনের মিলই সত্যিকারের মিল। মনের মিল ছাড়া শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরে যে দেহের মিল তার মত গ্লানিকর অবস্থা যে আর কিছু নেই একথাই খুব অল্পে অসাধারণ সংযমের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" উপন্যাস এই সমস্যাকে ভিত্তি করে লেখা। কিন্তু যোগাযোগ পড়লে মনে হয় কবি এই সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান করেন নি, উপন্যাসের মাঝপথে তাড়াতাড়ি দাঁড়ি টেনেছেন। অবশ্য "যোগাযোগে"র কুসুম ও মধুসূদন ছিলেন বিবাহিত দম্পতি। তাঁদের অন্য উপায়ে সমস্যা সমাধানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ সংগীন উঁচিয়ে ছিল। "শেষের পরিচয়ে" সবিতা ও রমণীবাবু বিবাহিত দম্পতি নন ; কাজেই তাঁরা অতি সহজেই কয়েকটি উত্তেজিত বাক্যের বিনিময়ে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করলেন।

এরপরে বইয়ের রঙ্গমঞ্চে আমাদের অতি পরিচিত বিমলবাবুর আবির্ভাব হয়। প্রথমে আমরা তাঁকে দেখি রমণীবাবুর বন্ধু হিসেবে। এবং রমণীবাবুর বন্ধুর পক্ষে যেমন হওয়া উচিত বিমলবাবুর তদতিরিক্ত বিশেষ কোন গুণ নজরে পড়ে না। সবিতাও প্রথমে বিমলবাবুর

লালসালোলুপ দৃষ্টি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন। কিন্তু কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে একটি ধনগর্বী নারীদেহ লোলুপ বর্বরের নীচতা থেকে প্রায় দেবতার আসনে রূপান্তরিত হলেন তার বিবরণ সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। প্রথমে তিনি রমণীবাবুর মুখে সবিতার কথা শুনে ওই ধরণের কুলটা স্ত্রীলোক সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে তার বেশী বিশেষ কিছু নয় এরকম ভেবেছিলেন। এসে দেখলেন অন্য রকম। চোখ কাণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। সবিতাকে চাক্ষুস দেখেই তাঁর ধারণা বদলাল। এখানেই বিমলের রূপান্তর আরম্ভ হল। এবং তা চরমে পৌঁছল যেদিন সবিতা ও রমণীবাবু বিচ্ছিন্ন হলেন। এরপর তাঁর এই দেহ কামনা বিরহিত প্রেম সবিতার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করল এবং তৃতীয়বারের মত সবিতাও আশ্রয় বদল করলেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে সবিতার সঙ্গে "শেষ প্রশ্নে"র কমলের সাদৃশ্য আছে কারণ কমল বারকয়েক আশ্রয় বদল করেছিল।

এবার আমাদের চোখ পড়ে রাখাল ও সারদার ওপর—এরা হচ্ছেন সবিতার আশ্রিত ও আশ্রিতা। আশ্রিতদের প্রতি সবিতার ব্যবহার কি রকম এবং তারাই বা সবিতাকে কি চোখে দেখে এ দুটি চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক একথাই বোঝাতে চেয়েছেন। অবশ্য তা ছাড়াও এরা আর একটা বড় কাজ করেছে; বইয়ের নিরবচ্ছিন্ন করুণ বাৎসল্য রসের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এরা মধুর রসের অবতারণা করেছে। তাছাড়া উপন্যাসের শিল্পকৌশলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে রাখাল গল্পের একটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আমরা দুটি দল বা জড়বিজ্ঞানের ভাষায় massএ ভাগ করতে পারি যেমন একদিকে ব্রজবাবু ও রেণুও অপরদিকে সবিতা, বিমলবাবু আর সারদা—এই দুই দলের যোগসূত্র হিসেবে রাখাল। রামায়ণের নলের মত রাখাল এদল ওদলের মধ্যে দুস্তর সমুদ্রের ওপর সেতু বেঁধেছে, যাকে ভয় করে মাঝে মাঝে সবিতা, বিমলবাবু ও সারদা এপার থেকে ওপারে গিয়ে ওপাড়ার খোঁজ খবর নিয়ে আসেন।

এবার গল্প যখন জমে উঠেছে ঠিক সে সময় মূর্ত্তিমান বেরসিকের মতন রমণীবাবুর চাকর এসে আমাদের সারদার আফিং খাওয়ার খবর দিল। অবশ্য সারদা কয়েক দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে এসে একেবারে সবিতার অন্দরমহলে আশ্রয় নিল এবং আরও কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে সে রাখালকে ভালবেসেছে। এসব দিক মিলিয়ে দেখলে তাকে চরিত্রহীনের সাবিত্রীর সমগোত্রীয়া ভাবা চলে। যেমন দুজনেই বালবিধবা, উভয়েই অপর এক পুরুষের প্ররোচনায় গৃহত্যাগ করে অপর একজনকে ভালবেসেছে; অন্যকথায় সাবিত্রী ও সারদার জীবনধারা অনেকটা একই। যদিও দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রকৃতিগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

এখনও বাকী আছেন রাখালের বন্ধু তারক। তারকবাবু উপন্যাসের বহির্বাটিতে আশ্রয় নিয়েছেন অন্দরমহলে ঢুকতে পারেন নি। শান্তশিষ্ট ছেলে বলতে সচরাচর আমাদের সমাজে যা বোঝায় তিনি তাই—পরপর কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করেই চাকরী এবং তারপর পুরোপুরি গৃহস্থ হওয়া। বইতে তিনি একটি অপ্রধান চরিত্র। তারক তাঁর হরিণপুরের বাড়ীতে সবিতাকে

কয়েকদিন রেখে উপন্যাসের একঘেয়েমিটা একটু কাটিয়ে দেন, আমরা অল্পক্ষণের জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

ইতিমধ্যে সবিতার এই ক্ষণিক অনুপস্থিতির অবসরে উপন্যাসের রংগমঞ্চে বসন্তের হিল্লোল বয়ে যায়—রাখাল সারদার প্রেম ঘনিয়ে ওঠে। উপন্যাসে এইটুকুই তারকের কর্ত্তব্য এবং তিনি তাঁর অংশে সুন্দর অভিনয় করেছেন।

বইয়ের চরিত্রগুলি আমি একটি একটি করে বিচার করে দেখলাম। এইগুলি হল উপন্যাসের পূর্ব্বকল্পিত তথ্য বা data। বইটি এই তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এখন দেখা যাক এর ঘটনাস্রোত কি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

বইয়ের গোড়াতেই আমরা দেখি যে সবিতার গৃহত্যাগের পর এক যুগ (বার বছর) কেটে গেছে। এর মধ্যে অবশ্য তিনি তাঁর স্বামীর ও মেয়ের খোঁজখবর প্রায়ই নিয়েছেন, এবং সন্তানের অশুভ বিবাহের আশংকায় তিনি চিন্তিত। যা হোক শেষ পর্য্যন্ত সবিতারই অনুরোধে ব্রজবাবু এই বিয়ে ভেঙে দিলেন এবং তাঁর গচ্ছিত টাকা ফেরৎ দিয়ে তাঁকে অভিভূত করলেন। এসব নানা কারণে তাঁর গৃহলিপ্সা ফের জেগে উঠল কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ও তাঁর স্বামীর ও সন্তানের সংস্কারাচ্ছন্ন মন এই মিলনে বাধা দিল।

এবার গ্রন্থকার নিপুণ শিল্পীর মত একটির পর একটি ঘটনা সৃষ্টি করে ঘটনাবলীকে একটি সংকটের দিকে নিয়ে চলেছেন। যেমন ধনীর দুলাল ব্রজবাবুর ব্যবসা ফেল করে প্রায় নিঃস্ব হওয়া; সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার এই যে একদিকে যেমন ব্রজবাবুর টাকার অংক উঁচু থেকে নিচুতে নেমেছে, তেমনি সবিতার টাকার অংক নীচু থেকে উঁচুতে উঠেছে। এ যেন বীজগণিতের গ্রাফের মতন। অথচ সবিতার দিকে একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্বেও না ব্রজবাবু না রেণু কেউই তাঁর দান গ্রহণ করেন নি। আবার আমরা রেণুকে কঠিন রোগ মুক্তির পরেই সবিতার চোখের সামনে ধুঁকতে ধুঁকতে রান্না করতে দেখি। একদিকে ব্রজবাবু যখন নিজের বাড়ীতে গিয়ে একঘরে হলেন তখন সবিতা অপরের বাড়ীতে গিয়ে রাণীর হালে কাল কাটাতে লাগলেন। এই বিপরীত ঘটনাবলী অদৃষ্টের এক নিষ্ঠুর পরিহাস।

অবশেষে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ব্রজবাবু ও রেণু বৃন্দাবনে স্থায়ী আসন পাতলেন। এদিকে দেশভ্রমণে বেরিয়ে বিমল ও সবিতাও বৃন্দাবনে এসে হাজির। যে আগুন এতদিন ধূমায়িত হচ্ছিল এখন তার হিসেব নিকেশের দিন এল। অস্ত্রোপচার করে রোগ সারানর মত গ্রন্থকার রেণুর মৃত্যু ঘটিয়েছেন—না হলে সবিতা, ব্রজবাবু, রেণু ও বিমলবাবুর মতন অতি কঠিন চরিত্রগুলিকে স্বমহিমায় অবিচলিত রেখে উপন্যাসের সুষ্ঠু সমাধান হয় না।

এবার অবশ্য সবিতা ব্রজবাবুর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে উপন্যাসিক যবনিকা ফেলেছেন; কিন্তু যে অবস্থায় প্রচলিত জনসমাজের বাইরে (অর্থাৎ বৃন্দাবনে, আমার মনে হয় এই স্থানটি প্রচলিত সমাজের বহির্ভাগ বুঝোতে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে) এই মিলন ঘটেছে তাতে আর মাধুর্য থাকে না। বিশেষতঃ আমরা যদি মনে রাখি যে বইয়ের আগাগোড়াই সবিতার স্নেহ করুণাধারা

রেণুর ওপর জ্যোৎস্নার মতন ঝরে পড়েছে এবং দু'জনের মিলনের পূর্বমুহূর্তে সেই রেণুই যখন আর রইল না তখন আমরা আর এই ব্যাপারে ইতরজনের ন্যায় মিষ্টান্নের আশায় পাত পাড়তে পারিনা। যাইহোক আমার মতে ঘটনাস্রোত লেখক যেখানে প্রবাহিত করেছেন একেই সুন্দরতম সমাধান বলে মনে হয়। স্বামী গরবিনী পত্নী হিসেবে সবিতাকে বিরাজ-বৌর দিদি বলা যেতে পারে। দুজনের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে "বিরাজ বৌ" যেখানে শেষ হয়েছে বিরাজের গৃহত্যাগে, "শেষের পরিচয়" তার পরিপূরক হিসেবে সেখান থেকে সবিতার গৃহত্যাগের পর আরম্ভ।

বইটির সর্বপ্রধান দোষ এর একঘেয়েমি। সত্যি কথা বলতে গেলে শরৎচন্দ্রের অপর কোন উপন্যাসকে এই দোষে দোষী করা যায় কি না সন্দেহ। তার কারণ অবশ্য এই বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন করুণ বাৎসল্যরসধারা গড়াতে থাকে। তার যেন আর ছেদ নেই, বিরাম নেই। এই করুণ রসধারা ভাদ্রের ভরা নদীর মতন দুকূল প্লাবিত করে সামনে যা পড়ে তাকেই নিশ্চিহ্ন করে ভাসিয়ে নেয়। গঙ্গার স্রোতে ঐরাবতের মত তাদের চিহ্নও দেখা যায় না। এই আবহাওয়া জগদ্দল পাথরের মত আমাদের বুকে চেপে আছে আমাদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

আসলে এই বইতে একটি মাত্র চরিত্র আছে—সবিতা। অন্যান্য চরিত্রগুলি তাকেই কেন্দ্র করে সৌরমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের মতন (সবিতা মানে সূর্যও বটে) নিজেদের স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিয়ে অনবরত স্ব স্ব কক্ষে আবর্তন করেছে। এই সবিতা কেন্দ্রিক চরিত্রগুলি যেন দাবার খুঁটির মতন সবিতার হাতেই পরিচালিত হচ্ছে। তাই এদের চালচলন আমাদের বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তুলনার আরও দু' একটি বইয়ের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক যেমন শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" ও টমাস মানের "দি ম্যাজিক মাউনটেন"। পথের দাবীও এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক (সব্যসাচী) বই। কিন্তু এতে নাটকীয় ভাব খুব বেশী থাকাতে বইটি আমাদের মনকে ধাক্কা মারতে মারতে শেষ পাতা পর্যন্ত টেনে নেয়, কোথাও একঘেয়ে লাগেনা। যেমন অপূর্ব ঘরে চুরি, তারপর ভারতীর ব্যবহার, থানায় যাওয়ার পথে অপূর্ব নিমাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গিরীশ মহাপাত্রকেই সব্যসাচী মনে করা, সভায় অপূর্ব মৃত্যুদণ্ড, সব্যসাচীর ক্ষমা, দলভাঙ্গা এসব ঘটনা নাটকীয় দ্রুতগতিতে ঘটে আমাদের তন্দ্রাতুর মনকে যেন ধাক্কা মেরে জাগিয়ে রাখে। অন্যদিকে শেষের পরিচয়ে নাটকীয় ভাবের অভাব বলে আমরা বইটি যেন নিরুৎসুক ভাবে গড়ি। আবার ম্যাজিক মাউনটেনের কথাই ধরুন। এটিও এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপন্যাস। কিন্তু এতেও নাটকীয় ভাব থাকায় এর একঘেয়েমি কমে গেছে। যেমন কেষ্টর-এর যক্ষা হওয়া, প্রণয়িনীদের সঙ্গে নায়ক প্রতিনায়কের আলাপ, এ ধরণের অন্যান্য ঘটনা এবং বইটায় শেষের দিকটা। এসবে এর একঘেয়ে ভাবটা কমেছে। শেষের পরিচয় থেকে এই একঘেয়ে ভাব কমাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেগুলি ধোপে টেকেনি। যেমন রাখাল-সারদার প্রণয় ও সবিতার হরিণপুর যাওয়া। অবশ্য সবিতা হরিণপুরে গিয়ে রাখাল সারদার প্রণয়ের রাস্তা পরিষ্কার করে দিলেন কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের দাসদাসীর মত এদের কোন

স্বাধীন সত্তা না থাকায় প্রেম ফুটে উঠল না। প্রেম কোরকটি সবিতার প্রচণ্ড তাপে ফোটার আগেই শুকিয়ে গেল। বিশেষতঃ রাখালের প্রতি সারদার প্রেমে বাহিরের ঘটনাবলীর (objective elements) প্রাবল্য থাকায় তা শিল্পের দিক দিয়ে নীচুদরের হয়েছে। যেমন সারদা নিজের জীবনের জন্য রাখালের কাছে ঋণী—ঋণ থেকে শ্রদ্ধা, রাখালকে দেবতা বলে ডাকা—(এমনকি প্রণয়কালেও রাখ লকে দেবতা ও আপনি বলে ডাকা শ্রুতিকটু) শ্রদ্ধা থেকে প্রেম।

শরৎসাহিত্যের যা অন্যতম বিশেষত্ব প্রেমিকার প্রেমাস্পদকে খাওয়ান তা এই বইতে হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পাঠক সারদার রাখালকে চুপি চুপি খাওয়ান লক্ষ্য করবেন। বইয়ে মাত্র এক জায়গায় সারদার রাখালকে চা খাওয়ানোর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু তা গ্রীক সাহিত্যের তরোয়ালের নীচে ডেমোক্লিসের আহারের মতন আশংকায় মলিন। রাখালের সঙ্গে আমরা যখন সারদার ঘরে যাই তখন রাখালের পকেটে রেণুর টেলিগ্রাম এবং আমরাও ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঘড়ি দেখি। এ অবস্থায় আর যাই হোক আরামে চা পান চলতে পারে না।

আমাদের সুদূর সন্ধানী গ্রন্থকারের অনবরত সবিতার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ঝলসে গেছে, তাই তিনি আমাদের ঘরের কোণে ম্লানমুখী বধূটিকে প্রায় উপেক্ষা করেছেন। তার ভবিষ্যৎ অনেকটা চির অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন। এরা সত্যিই 'কাব্যের উপেক্ষিত'। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রীর ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পাঠক 'চরিত্রহীনে' সতীশের আরোগ্য লাভের পর উপেনের সঙ্গে সাবিত্রীর বিদায়বেলায় সতীশকে যা বলেছিল তা পড়লেই আমার বক্তব্য বুঝবেন। যাই হোক গ্রন্থকার উপেক্ষা করলে কি হবে পাঠক কিন্তু রাখাল সারদাকে শেষ পর্যন্ত ভুলতে পারে না।

বইটির একঘেয়েমি আরও চোখে লাগে হাস্যরসের অভাবে। যে দুএকজায়গায় হাস্যরস আমদানীর চেষ্টা আছে তা এত বিসদৃশ যে আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারি না। এইরকম হাস্যরসহীন বই বোধ হয় শরৎসাহিত্যে আর নেই।

শরৎচন্দ্র আর যে দুটি বইতে বাৎসল্যরসের ছবি এঁকেছেন যেমন রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে সেগুলি পড়তে খারাপ লাগে না এই কারণে যে সেখানে বাৎসল্যরস করুণ নয় ও তারা আয়তনে এর চেয়ে ছোট। ও বইগুলিতে হাস্যরস যথেষ্ট আছে। এই বইটিতে আর একটি শ্রুতিকটু জিনিষ হচ্ছে রাখালের মুখ দিয়ে নির্বিচারে আধুনিকাদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ। এটা সত্যিই অসহ্য লাগে এইজন্যে যে এগুলি সেই রাখালের উক্তি যে প্রাক্‌যুগে এদেরই অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়েছিল। এই উক্তিগুলি রাখাল সারদীয় চরিত্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করেছে। এইসব নানা কারণে বইটা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে পড়ছে।

পরিশেষে শেষের পরিচয় নামটা সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। বইয়ের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে এই নামটি খুবই উপযুক্ত হয়েছে। এই নামের দ্বারা শরৎচন্দ্র একথাই বলতে চেয়েছেন যে মুহূর্তের ভুল মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলী মিলিয়ে তার পরিচয়। যাদের আমরা পাপী বলে ঘৃণা করি তাদের ভেতরেও দেবত্ব আছে। মনে হয়

গোটের ফাউষ্টে এক জায়গায় পড়েছি যে মানুষ এখনও পূর্ণ মানুষ হয়নি, সে যতক্ষণ পূর্ণ (complete) না হচ্ছে ততক্ষণ সে মাঝে মাঝে ভুল করবেই কিন্তু ভুলই তার একমাত্র পরিচয় নয়। সে যে পূর্ণতা প্রয়াসী এই ভুলগুলিই তার প্রমাণ। সবিতার চরিত্রের এইদিকে লক্ষ্য রেখে শরৎচন্দ্র তাঁকে এমনভাবে এঁকেছেন যে আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি। তিনি যে পাপী তা আমাদের ভাবতেও কষ্ট হয়।

জীবেন্দ্রকুমার গুহ

রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতার মনস্তত্ত্ব

সংগীতের আসরে শ্রোতা যেমন গায়কের গানের দোষগুণ বিচার করে, গায়কেরও তেমনি শ্রোতার মনোভাব লক্ষ্য করার সুযোগ ঘটে। সংগীতে রসসৃষ্টির জন্য গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে রুচির সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। তা না হ'লে গানের উদ্দেশ্য অনেকখানি ব্যর্থ হয়। একটা ঘটনা শুনেছিলাম। কোন আসরে একজন খ্যাতনামা গায়কের লঘুসংগীত পরিবেশনের কথা ছিল। যথেষ্ট লোকসমাগম হয়েছিল। গায়ক ইচ্ছে করেই গোড়ায় ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইতে আরম্ভ করলেন এবং ফলে দেখা গেল ক্রমশঃ ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, শ্রোতারা যে মনোভাব নিয়ে এসেছিলেন তা পূরণ না হওয়ায় উক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমানে রবীন্দ্রসংগীতের নানা অনুষ্ঠানে ও সম্মেলনে বহু প্রকার শ্রোতার সাক্ষাৎ ঘটে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: সাধারণ শ্রোতা ও সমঝদার।

সাধারণ শ্রোতা: সাধারণ শ্রোতা বলা চলে তাঁদের, যাঁরা গানের ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে বড়ো একটা ওয়াকিবহাল নন। কানে শুনে ও বুদ্ধি দিয়ে গানের বিচার করেন। অবশ্য এঁদের সকলকে একই দলে ফেলা চলে না। বিষয়টি আর একটু বিস্তারিত বলা প্রয়োজন:—

ক। এক শ্রেণীর শ্রোতা আছেন, যাঁরা রেডিয়ো, রেকর্ড ও নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত শুনে বড়-গাইয়ে ও ছোট-গাইয়ে সম্বন্ধে নিজেদের মত গড়ে তুলেন। তাঁরা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে অমুক-অমুকের গান শুনলেন—এটুকু বলেই অনেক সময় শেষ করেন। বড় জোর দু একটা মন্তব্য করেন। সমালোচনার দিক থেকে, এঁদের কাছ থেকে তেমন কিছু আশা করা যায় না।

খ। আর এক শ্রেণীর সাধারণ ও নিরপেক্ষ শ্রোতা দেখা যায় যাঁরা যেদিন যাঁর গান শুনে ভাল বা খারাপ লাগল তদনুযায়ী নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। গানের ভালমন্দ বিচার করা বিষয়ে কানে শুনে ভাল লাগা, একটি প্রধান কথা। সে হিসেবে একদিক থেকে এঁদের মতের মূল্য আছে। যদিও অন্যদিক গানের ব্যাকরণের দিক সম্বন্ধে মত দিতে তাঁরা আপারগ।

গ। ঐ-শ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যে কিছু বিশেষ শ্রোতা আছেন যাঁরা, রবীন্দ্রনাথের গানকে কাব্যের দিক থেকেও বিশেষভাবে বিচার করেন— হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ, শব্দের লঘুত্ব-গুরুত্ব, নেতিবাচক ক্রিয়ার পুনঃপ্রয়োগ, কাব্যের ছন্দ প্রভৃতিও এঁদের বিচার্য বিষয় হয়। এঁদের মতামতের

যথেষ্ট মূল্য আছে। অনেক সময় দেখা যায় সমঝদার শ্রোতাদের সঙ্গে এঁদের মতামত মিলে যায়।

তারপর আসছে সমঝদার শ্রোতার কথা। সমঝদার শ্রোতাদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। প্রথমতঃ যাঁরা গানের ব্যাকরণের দিক নিয়েই বেশী মাথা ঘামান। গায়কগায়িকার কণ্ঠ সুরে আছে কিনা, গানের তাল ঠিক হচ্ছে কিনা ইত্যাদিই এঁদের বিচার্য বিষয়। এঁরা বিশেষ ভাবে ক্ল্যাসিকাল-সংগীতের প্রভাবাধীন, অথচ রবীন্দ্রসংগীতও ভালোবাসেন। অন্য শ্রেণীর এবং সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর—যদিও সংখ্যায় মুষ্টিমেয়— সমঝদার শ্রোতা গানের কাব্য ও ব্যাকরণ দুইই বিচার করেন। যেমন গায়কগায়িকার কণ্ঠ, সুরজ্ঞান ও ছন্দজ্ঞান তেমনি গানের সুর, উচ্চারণ, ভাব ও গায়কীও এঁদের বিচার্য বিষয় হয়। এঁদের নিরপেক্ষ মতামত, গায়কগায়িকাকে উন্নতির পথে যথেষ্ট সহায়তা করে।

একটি কথা বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা যেমন বহু, গানের শ্রেণীও তেমনি অনেক। একই কণ্ঠে যেমন সব শ্রেণীর গান মানায় না, তেমনি একই শ্রোতা সব শ্রেণীর গান পছন্দ করেন না, দেখা যায়। এই পছন্দ-অপছন্দ রবীন্দ্রসংগীত শ্রোতার মতামতের ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

পূর্বে বলা হয়েছে, সংগীতে রসসৃষ্টির জন্য গায়ক ও শ্রোতার মনোভাবের সামঞ্জস্য প্রয়োজন। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে—একথা সর্বজনবিদিত। এ কথার সত্যতা অটুট রাখবার জন্য গায়ক ও শ্রোতা দুয়েরই দায়িত্ব আছে। গায়কের শুধু সুরের দিক ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করলেই চলে না, কাব্যের দিকও অনুশীলন করতে হয়। শ্রোতারও গানের কাব্য ও সুর এবং সর্বোপরি গানের চিরাচরিত ধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের মনে হয়, এখন পর্যন্ত তেমন শ্রোতৃসমাজ বিরাটভাবে গড়ে ওঠে নি।

প্রফুল্লকুমার দাস

রেডিও-নাটক-সিনেমা

নাটকে সমস্যা

নাটক মূলত অভিনয়ের জন্যে বলেই, নাটকের আবেদন সরাসরি দর্শকদের হৃদয়তন্ত্রীকে নাড়া দেয়। নাটকের কাহিনী-কথনে ঢিলেঢালা ভাব একেবারেই অচল; সেখানে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য কিম্বা সংলাপ একেবারেই বর্জন করতে হয়। অন্যথায় নাটকের বক্তব্য হারিয়ে যায়, নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়, এবং সর্বোপরি নাট্যকারের অক্ষমতা প্রকট হয়ে ওঠে। বস্তুত, নাটকের আর্ট অত্যন্ত দুরূহ আর্ট। একথা যেমনি অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি নাটক রচনার ক্ষেত্রেও। অথচ সমকালীন সমাজসমস্যাকে তুলে ধরার সুযোগ নাটকেই সবচেয়ে বেশী।

সমস্যা নাটকের দেহ—তা সমাজের সমস্যাই হক, আর মানুষের চিরন্তন বৃত্তিগুলির সমস্যাই হক। চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে নাটকের প্রাণ বলা যেতে পারে—যার অসদ্ভাবে নাটক ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যমঞ্চের অনেক উন্নতি ঘটেছে, বিশেষ করে য়ুরোপ ও আমেরিকায়। নাটক রচনার আঙ্গিকও অনেক বদলে গেছে। "প্রস্তাবনা" দিয়ে কালিদাসের নাটক সুরু হত। প্রস্তাবনার তাৎপর্য এই যে, সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে নান্দী সমাধা করেন, তারপর প্রবিষ্ট নটবিশেষের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নাট্যকার কবির এবং অভিনেয় নাটকের উল্লেখ করেন। কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটকের ইতিবৃত্ত বলে উক্ত অভিনেতা প্রস্থান করেন। তারপর সুরু হয় প্রথম অঙ্ক।

আজকের যুগের নাটকে কালিদাসের যুগের প্রস্তাবনা অনুপস্থিত। তার কারণ আগেই বলেছি—নাটক রচনার আঙ্গিক আজ স্বতন্ত্র। গ্রীক নাটকেও প্রস্তাবনার স্থান ছিল। বার্তমানিক য়ুরোপীয় নাট্যকারগণ ভিন্ন পদ্ধতিতে নাটক রচনা করেন। এদিক থেকে সফোক্লিস কিম্বা ইউরিপিডিসের সঙ্গে বার্নার্ড শ' বা ইউজেন ও'নীলের ফারাক প্রায় আসমান-জমিন।

এতো গেল রচনারীতির কথা। এদিকে যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আচার-বিচার, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। শক্তিশালী শিল্পীর রচনায় তাঁর নিজের যুগ অমর হয়ে থাকে। কাব্যরসের বিচারে কালিদাসের নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী হলেও, তাঁর যুগ আর আমাদের যুগের মধ্যে ব্যবধান অসেতুসম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বধিত আমরা, আমাদের কাছে সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনা দূর নক্ষত্রলোকের বলে মনে হয়। তৎকালীন জীবন ছিল সহজ, সরল ও সুন্দর; সমস্যা-ভারাক্রান্ত একালীন জীবনে অসংখ্য জটিল গ্রন্থি, সুন্দরের ধ্যান অবসিত—সত্য শুধু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দোলাচলচিত্ততা। বিগত যুগের নাটকের সঙ্গে আজকের নাটকের আরো একটা বড় ফারাক এই যে, তৎকালীন জীবন যেমন ছিল মন্থর, তেমনি নাটকের

গতিও। তখন লোকের প্রচুর অবসর, কাব্যরস পান করে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসতেন দর্শকবৃন্দ, আর এদিকে নাটক অগ্রসর হত মন্দাক্রান্তা ছন্দে। কাব্যরসে অভিসিঞ্চিত কাহিনী ঢিমে একতালার ঠেকায় চলুক, ক্ষতি নেই, আলাপটি মেজাজী হলেই হল। কিন্তু বর্তমান যুগে এই ধীরগতি একেবারেই অচল, তাই দ্রুত লয়ে গান সুরু করে দেওয়াই বিধেয়।

সেক্সপীয়র নাটকে যুগসমস্যা নয়, মানবিক প্রবৃত্তির সমস্যাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। এই কারণে সেক্সপীয়র রচিত নাটকের আবেদন আজ পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়নি। মানব-চরিত্রের এমন নিখুঁত বিশ্লেষণ আর কোন্ নাট্যকারের মধ্যে দেখা গেছে? কিন্তু তবু বলব, সেক্সপীয়রের নাটকে কিঞ্চিৎ মেলোড্রামাটিক সুরও আছে। তাছাড়া, নাটকের পাত্রপাত্রীরা কারণে-অকারণে মঞ্চে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বক্তৃতা দেবে—এমন পরিস্থিতির অবতারণা আমাদের কাছে নাটক রচনার দুর্বলতা বলে মনে হয়। তার ওপর আছে স্বগতোক্তির ছড়াছড়ি। আধুনিক নাটক থেকে স্বগতোক্তি প্রায় উঠে গিয়েছিল। ইউজেন ও'নীল তাঁর নাটকে তাকে নতুন ভাবে ব্যবহার করেছেন।

দীনবন্ধুর মিত্রের নাটকাবলীতে যুগসমস্যা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রচনা-কৃতিত্বও তাঁর কম নয়। কিন্তু তার আবেদন অধুনা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ। তার কারণ, সেখানে সমস্যা একান্তই সমকালীন।

রবীন্দ্ররচিত নাটকে উপস্থাপিত সমস্যাগুলি চিরন্তন সমস্যা। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশকে আশ্রয় করে নাটকের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। কোথাও ইতিহাসের প্রতিচ্ছায়া, কোথাও রূপকের আড়াল—তবু সবার ওপরে আছে কোন সমস্যা কিম্বা কোন তত্ত্বকথা।

তাহলে কী নাটকে চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকার যুগের দাবীকে অস্বীকার করবেন? মোটেই তা নয়, বরং যুগের দাবীই আগে মানা দরকার। যুগকে স্বীকার করেও সাময়িকতার বেড়াজাল ডিঙোনো সর্বজনের কর্ম নয়। দু-একজন লেখকই তা পারেন। বাদবাকী সকলে সমকালীন যুগকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই যথেষ্ট। এর বেশী আশা দুরাশা।

বীরেন বসু

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন

টিপ-টিপ বৃষ্টির মধ্যে কাদা-প্যাচপ্যাচে কিম্বা মুষলধারায় বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর জল-দাঁড়ানো অপ্রশস্ত পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া একটা নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ পঁচিশে বৈশাখ সকালে কি বিকেলে এখানে আসার সময় আকাশ থাকে নির্মেঘ নীল, রাস্তা শুকনো খটখটে। কিন্তু এখন মাথার ওপর ভারী মেঘের চাঁদোয়া টাঙানো। কখন তা থেকে টুপ টুপ জল ঝরে পড়ে তার ঠিক কী। লোনা-ধরা জীর্ণ সরিকী বাড়ীর উঠোনে তাই ত্রিপলের আচ্ছাদন। গান বা বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টির একটানা শব্দও কানে আসে।

পয়লা আষাঢ় থেকে আটদিন ধরে এখানে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। বৈশাখের হট্টমেলা পেরিয়ে আষাঢ়ের সজল পরিবেশে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের মধ্যে নতুনত্বের স্পর্শ আছে বৈকি। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রতি বছর পঁচিশে বৈশাখ আরম্ভ হয়। নানা বাধা-বিপত্তির ফলে এবারকার অনুষ্ঠান পেছিয়ে গেছে। একাধিক দিনব্যাপী রবীন্দ্রজন্মোৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনই প্রথম করেন। আজকাল এই ধরণের অনুষ্ঠানের একটা হুজুগ দেখা দিলেও এবং পরিবেশিত সঙ্গীত ও নাটকাদির মান একেবারে নেমে গেলেও, আলোচ্য সম্মেলনের অনুষ্ঠানগুলি, বিশেষ করে প্রথম কয়েক বছরে উপস্থাপিত নৃত্যনাট্য ও নাটক সম্পর্কে অনায়াসেই প্রশংসা-উক্তি করা চলে। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে "বসন্ত", "শ্যামা", "শাপমোচন" "তাসের দেশ", "ক্ষুধিত পাষাণ" প্রভৃতি অসংখ্য রবীন্দ্ররচনার সার্থক অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছি।

দুঃখের বিষয়, গত ছ তিন বছরে সম্মেলনে পরিবেশিত নাটকাদি সম্পর্কে তেমন উচ্ছ্বসিত হতে পারা যায় না। বৈশাখের হট্টগোল থেমে যাবার পর অনুষ্ঠান করার জন্যেই হক কিম্বা ঠাকুরবাড়ীর গুণেই হক এবারকার অনুষ্ঠানগুলির মান নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে। অবশ্য চিরাচরিত রীতির ব্যত্যয় দেখা যায়নি। প্রতিদিন একটি আলোচনা, কিছু একক সঙ্গীত ও আবৃত্তি, একটি নৃত্যনাট্য বা নাটক জাতীয় কোন-কিছু পরিবেশনের মধ্যেই অষ্টাহব্যাপী অনুষ্ঠান আবর্তিত হয়েছে। এবং আলোচনার সময় সদস্যদের বাইরের চত্বরে পদচারণা অথবা সিগারেট কি চা পান এবং নাটক বা নৃত্যনাট্য আরম্ভ হওয়ার সময় ভিতরে প্রবেশ—এ অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটেনি। দুদিন কি তিন দিন কেবলমাত্র আলোচনা, রচনাপাঠ বা আবৃত্তি এবং একক সঙ্গীতের ব্যবস্থা করার পথে যে কী বাধা তা বুঝে উঠতে পারি না। অথচ পূর্বোক্ত চলতি রীতি আঁকড়ে থাকার ফলে প্রত্যেকটি আলোচনাই মাঠে মারা যায়, রবীন্দ্ররচনা পাঠ বা আবৃত্তির সময় সদস্যবৃন্দ কথোপকথনে মত্ত থাকেন, আর

একক সঙ্গীতের উপযুক্ত রসগ্রহণ সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে এইসব অনুষ্ঠানের দিন আলাদা করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত নয় কি? একথা অনস্বীকার্য যে, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের অন্ততঃ বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার প্রতিও বিশেষ আগ্রহশীল।

এবং এই দল যে ক্রমশঃ ভারী হচ্ছে, এবারকার অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তার প্রমাণ পেলাম। এ বছর মোট পাঁচটি আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্বোধনী-ভাষণ এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির ভাষণ দেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় "রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়" মোটামুটি বিশ্লেষণ করলেন। এই পর্যায়ের রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি, কারণ এগুলিকে অনেকেই নস্যাৎ করে দিতে চান। অথচ আমরা জানি, এসব কবিতা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের অনেক উন্নত সৃষ্টিকর্মই বাদ পড়ে যায়। এদিক থেকে দেখলে নারায়ণবাবুর প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। কাজী আবদুল ওদুদের আলোচনা রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রদর্শনের নিগূঢ় বিশ্লেষণ। তবে তিনি যেমন জমিয়ে আলোচনা সুরু করেছিলেন, তাতে মনে হল, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে তাঁর আলোচনা খণ্ডিত রয়ে গেছে। ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর আলোচনার বিষয় ছিল "রবীন্দ্রনাথ ও দর্শন"। ডাঃ ব্রহ্মচারীর আলোচনায় কিন্তু দর্শনই বেশী অংশ জুড়ে ছিল, রবীন্দ্রনাথ কম। তবু আপত্তির কারণ থাকত না, যদি বক্তা স্মরণ রাখতেন যে, সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই ভক্তির চ্যাটচ্যাটে রসে অবগাহন করতে আসেননি। অমল হোম "রবীন্দ্র-সমালোচনা" এই বিষয়কে অবলম্বন করে দুজন আধুনিক সমালোচককে বেশ একহাত নিলেন। প্রথম সমালোচকের রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালোচনার তীব্র নিন্দা করলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বপক্ষে যে-সব কথা বলা যায়, তা ভক্তি-গদ্‌গদ হোম-মশায়ের মনে এল না। দ্বিতীয় সমালোচকের আলোচনা যে সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে মুদ্রিত পাঠকদের কয়েকটি চিঠির বক্তব্য আর হোম-মশায়ের বক্তব্য হুবহু এক। এবং বার বার "আমার জনৈক বিদেশী বন্ধুর কাছে জানলুম" এই উক্তি বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতাই জাহির করেছে। শ্রীহোমকে মনে করিয়ে দিই, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে যা সৃষ্টি করে গেছেন, তাকে খাটো করতে চাইলেই তা খাটো হয়ে যাবে না। অনর্থক কেন তাঁর সামান্য বিদ্যার পুঁজি নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের জন্যে ওকালতি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই লজ্জা দিচ্ছেন।

কী কারণে জানিনা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করেন যাঁরা, তাঁদের গান দিন দিন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে, প্রখ্যাত শিল্পীদের কথাই এখানে উল্লেখ করব, কারণ নতুন শিল্পীরা আজকাল সত্যি কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে সুমিত্রা সেন, প্রতিমা চক্রবর্তী পূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, আভা বল, তপন গুহরায়ের গান ভাল লাগল।

নৃত্যনাট্য বা ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে কথাকলি শিল্পীগোষ্ঠীর "চণ্ডালিকা"ই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে। কোন নৃত্যনাট্যের অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে প্রথম দরকার নৃত্য ও সঙ্গীতের সার্থক মালা-বদল। কথাকলি প্রযোজিত "চণ্ডালিকা"র এ-জিনিষটি এমন সুন্দরভাবে ঘটেছে যার জন্যে সঙ্গীত পরিচালক অশোক সরকার, নৃত্য পরিচালিকা মঞ্জুশ্রী চাকী এবং অংশগ্রহণকারী শিল্পীদল

প্রশংসা দাবী করতে পারেন। চণ্ডালিকার ভূমিকায় নৃত্যাংশে আরতি গুপ্তের ও সঙ্গীতাংশে শ্রীলা সেনের এবং মা মায়ার ভূমিকায় নৃত্যাংশে উৎপলা দাসের কৃতিত্বই সর্বাধিক। আরতি গুপ্তের নৃত্যাভিনয়ে চণ্ডালিকার জীবনদ্বন্দ্ব যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি উৎপলা দাসের নৃত্যনৈপুণ্যে মা মায়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব সার্থক রূপ পেয়েছে। চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরাট কণ্ঠের "জল দাও" গানটি উল্লেখনীয়। শিশু কলাকেন্দ্রের "ভানুসিংহের পদাবলী" এবং আনন্দ নিকেতনের "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"র কয়েকটি গান ভাল হয়েছে এবং নৃত্যাংশ চলনসই। "ভানুসিংহের পদাবলীতে" গানগুলির মাঝে যুক্ত পাঠ্যাংশ অত্যন্ত দুর্বল রচনা এবং কোন রকমে ব্যাখ্যাসহ গানগুলিকে পর পর সাজানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বা ছোটগল্পের সার্থক নাট্যরূপ আজ পর্যন্ত দেখিনি। এসব ক্ষেত্রে প্রায়শই রবীন্দ্ররচনার বিকৃতি ঘটে এবং অক্ষম লেখকদের হাতে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য ছোটগল্প ও মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। (এর মধ্যে একমাত্র বহুরূপীর "চার অধ্যায়" অভিনয়ের গুণে মোটামুটি উতরে গেছে। "চার অধ্যায়ে"র নাট্যরূপ খণ্ডিত—সেখানে মাষ্টার মশায়ের ভূমিকাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।) অথচ নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের মত প্রতিষ্ঠানও দিনের পর দিন এর প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন কেন, তা বোঝা দুঃসাধ্য। এবার "কাবুলিওয়ালা" ও "মালঞ্চে"র নাট্যরূপ পরিবেশিত হল। নাট্যরচয়িতার মাত্রাজ্ঞানের অভাবে "কাবুলিওয়ালা" অভিনয়ে অনবদ্য হয়েও পুরোপুরি জমতে পারেনি। দু তিনটে দৃশ্য অনায়াসে বাদ দেওয়া চলত এবং তার ফলে নাট্যরস আরো ঘনীভূত হতে পারত। তবু বলব, "কাবুলিওয়ালা"ই এ বছরের শ্রেষ্ঠ নাট্যানুষ্ঠান, যার মূলে রয়েছে ছোট্ট মিনির ভূমিকায় ঝিঙ্কার অপূর্ব অভিনয়। "মালঞ্চে"র মধ্যে নিরঞ্জার অভিনয় একমাত্র দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল। তাছাড়া সকল দিক দিয়ে "মালঞ্চ" অসার্থক হয়েছে। মনস্তত্ত্বমূলক গল্পকে নাট্যীকৃত করার দুর্লভ ক্ষমতা নাট্যকারের অনায়ত্ত, তাই গল্পের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির প্রকাশ দুর্বল এবং নীরজা, আদিত্য ও সরলা এই তিন কেন্দ্রের সঙ্ঘাত ও এদের অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয়-চিহ্ন নাটকে অনুপস্থিত। আদিত্য ও সরলার প্রাণহীন অভিনয়ও নাটকের ব্যর্থতার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। বহুরূপীর "স্বর্গীয় প্রহসন" বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। অতিঅভিনয়ের প্রয়াস বর্ত্তমান থাকলেও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটুটের "মুক্তির উপায়" একেবারে অনুল্লেখ্য নয়। তবে "মুক্তির উপায়" নাটকাটির অভিনয় করলেই প্রয়োজক ও পরিচালক অধিকতর নাট্যবোধের পরিচয় দিতেন।

আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর সাঙ্কেতিক নাটকগুলি। এই নাটকগুলির অভিনয় সচরাচর দেখা যায় না। সম্প্রতি "রক্তকরবী" নাটকের অভিনয়ে বহুরূপী সম্প্রদায় বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু মহাজাতি সদনে তাঁদের "রক্তকরবী"র প্রথম অভিনয় দেখে আমি হতাশই হয়েছিলাম। তার কারণ, সেখানে "রক্তকরবী"র রূপকটিকে টেনে-হিঁচড়ে বার করে তাকে অন্য রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল। এ প্রচেষ্টার আংশিক উপস্থিতি দেখলাম এবারকার নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে লিট্‌ল্ থিয়েটারের "অচলায়তন" নাটকাভিনয়ে।

অচলায়তনের বাসিন্দারা গোড়া থেকেই উঁচু পর্দায় সংলাপ-উচ্চারণ করে নাটকের আসল সুরটিকেই নষ্ট করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তনে" বেশ কিছু গান আছে, এবং নাটকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে এসব গানের সম্পর্কও অঙ্গাঙ্গী; লিট্‌ল্ থিয়েটারের "অচলায়তনে" অনেকগুলি গান উহ্য থাকাতে নাটকের পক্ষে ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই। "অচলায়তন"কে যথাযথ রূপ দেওয়ার প্রতি অনীহা কী পরিচালক উৎপল দত্তের সস্তায় কিস্তিমাৎ করার চেষ্টার নামান্তর নয়?

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের কর্মোদ্যম যাতে বাৎসরিক সম্মেলনে আয়োজনেই নিঃশেষিত হয়ে না-যায়, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এবছর তাঁরা রবীন্দ্রনাথের একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। বিনা পারিশ্রমিকে এই মূর্তিনির্মাণের দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পী সুনীল পাল। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কাজে সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অগ্রসর হয়েছেন এবং মূর্তিনির্মাণের কাজ আগামী পঁচিশে বৈশাখের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শিল্পী সুনীল পাল।

সিদ্ধার্থ সেন

নজরুল সাহিত্য সম্মেলন

শোভাবাজার রাজবাটীতে সম্প্রতি নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের চারদিনব্যাপী প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হল। সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ গোড়াতেই তাঁদের কর্মসূচী সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন:

"নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, কবির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ এবং যাবতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি খণ্ডাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। কবির সহযোগী সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এই উদ্দেশ্যে একটি পরিষদ শীঘ্রই গঠিত হবে।

"তাছাড়া জেলা হিসাবে প্রতি বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রদের নজরুল বৃত্তিদানের স্থায়ী পরিকল্পনাও সম্মেলনের বিবেচনাধীন আছে।

"পরিশেষে একটি কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই। আত্মপ্রচারের প্রেরণা থেকে আমরা নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করিনি। সব রকম হুজুগপ্রিয়তারও আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। আমাদের সামনে রয়েছে গঠনমূলক কর্মসূচী—যার আভাস উপরিউক্ত অংশে দিয়েছি।"

এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যেতে পারে যে সম্মেলনের কর্মতৎপরতা বাৎসরিক অধিবেশনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিকৃতি সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় অকুণ্ঠ প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করা না গেলেও, তদ্‌রচিত সঙ্গীতগুলি যে বাংলার সঙ্গীতভাণ্ডারকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেছে এ-বিষয়ে মতানৈক্যের অবকাশ নেই। বস্তুত, নজরুলকে যদি ভাবীকাল স্মরণ রাখে তো গীতিকার ও সুরকার হিসেবেই রাখবে। তাই নজরুল সাহিত্য সম্মেলনে নজরুল ইসলামের সঙ্গীতপ্রতিভার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। সম্মেলনে উপস্থিত থেকে এ-অভাবটা বড় বেশী করে ঠেকেছে।

নজরুলগীতি পরিবেশনেও আরো যত্নবান হওয়া দরকার। এ বছরের সম্মেলনে ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া, বাঁশরী লাহিড়ী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নির্মল চৌধুরী, সুনীল ঘোষ এবং কথাকলি, বাসন্তী বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠানের শিল্পিবৃন্দের গান ভাল লাগল।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁর উদ্দাম জীবন ও দুর্বার প্রাণশক্তি আমাদের কাছে বিস্ময়কর লাগে। "কল্লোল" ও "কালিকলম" এই দুটি সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল, নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পদার্পণের কাহিনী এবং তাঁর বেপরোয়া জীবনের এক অন্তরঙ্গ চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "কল্লোল যুগ" এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "চলমান জীবন" বই দুটিতে। নজরুল সাহিত্য সম্মেলনে কবির বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের আরো অনেক কথা জানা গেল। শ্রীমুখোপাধ্যায় তখনকার কথাও বললেন, যখন নজরুল লিখতেন গল্প, আর তিনি নিজে লিখতেন কবিতা।

নাটক জাতীয় অনেকগুলি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে লেকপল্লী মণিমেলার শিশুশিল্পীদল কর্তৃক অভিনীত ব্যঙ্গনক্সা "দে গরুর গা ধুইয়ে"। শিশুদের অভিনয়ের খোলামেলা ভাবটি নজরুল সাহিত্যের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে। সকলেই জানেন বোধ হয়, "দে গরুর গা ধুইয়ে" বুলি নজরুলের মুখে সদা সর্বদা লেগে থাকত।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে কবি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাঁকে নিরোগ করার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা দেশে আজ আর এমন কোন কবি বা সাহিত্যিক নেই, যিনি পরুষ কণ্ঠে নিরলঙ্কৃত ভাষায় গেয়ে উঠবেন :

বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।

এমন কবির নামে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাজে অগ্রসর হয়েছেন বলে নজরুল সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ জানাই।

সুস্মিতা সেন

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ২, ন্যায়রত্ন লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।